প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯০

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২

[A Bengali Translation of *Indian National Movement : The Long-Term Dynamics* by Bipan Chandra. Complete and unabridged]

অশোককুমার চৌধুরী কর্তৃক গুরু প্রিন্টিং, ১৭৪ রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত ও কনক বাগচী কর্তৃক কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত।

জি. এম. তেলাং এবং মোহিত সেনকে
আমার পুরানো বন্ধু
যাঁদের দ্বারা আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি

প্রস্তাবনা

এই রচনার একটি প্রাথমিক খসড়া ১৯৮৫-র ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে পঠিত হয়। আমার সহকর্মী মৃদুলা মুখার্জী ও আদিত্য মুখার্জী এবং নবীন গবেষক সুচেতা মহাজনের সঙ্গে মিলিত উদ্যোগে ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে যে গবেষণা বর্তমানে আমি করছি, এতে বিবৃত রয়েছে তারই কিছু প্রাথমিক বক্তব্য।

এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এমন একটি কাঠামো গড়ে তোলার উপর, যার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালনগত প্রকরণটিকে ধরা যাবে—বিশেষত সেই সময়ে, যখন গান্ধী এই সংগ্রামের কর্ণধার। এই কাঠামোর মধ্যেই আমি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় এবং এর বিভিন্ন চেহারা—যাদের মধ্যে রয়েছে বৈধতার সীমাতিক্রমী এমন সব গণ-আন্দোলন ব্যাপকতায় যা বিশ্ব-ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব, সাংবিধানিক কার্য-কলাপ, গঠনমূলক কর্মোদ্যোগ, এবং সংবাদপত্র, সমিতি, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে বিক্ষোভ-সংগঠন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের দৈনন্দিন প্রচার।

এছাড়াও আন্দোলনের অন্য কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এর বিভিন্ন মতাদর্শগত এবং কার্য-সূচিগত দিক, অহিংসার ভূমিকা ও তাৎপর্য, নেতৃমণ্ডলীর সঙ্গে জন-সাধারণের সম্পর্ক, আন্দোলনের মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক মুক্তমনস্কতা, এবং এর আদর্শগত রূপান্তরের সম্ভাবনা।

এই বক্তব্যের উপস্থাপনায় মহাফেজখানার গবেষণা, ব্যক্তিগত সংগ্রহের কাগজপত্র, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের রচনাসংগ্রহ তথা নির্বাচিত রচনার সাহায্য নেওয়া ছাড়াও ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের নেওয়া সারা দেশ জুড়ে দেড় হাজারেরও বেশি মানুষের সাক্ষাৎকার। এঁরা হয় গ্রামে, তালুকে, প্রাদেশিক অথবা সর্বভারতীয় স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, নয় ছিলেন ঔপ-নিবেশিক শাসনযন্ত্রের অঙ্গ। এঁদের সহযোগিতা এবং আতিথেয়তার কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

সহকর্মীরা ছাড়াও, এই রচনা গড়ে-ওঠায় সাহায্য করেছেন অনেক বন্ধু ও ছাত্রছাত্রী। শশী যোশী, ভগওয়ান যশ, কে. কে. এন. কুরুপ, ভি, রামকৃষ্ণ ও ললিতা রামকৃষ্ণ, সি. এস. কৃষ্ণ ও ঊষা কৃষ্ণ, শান্তা সিংহ, জে. রুদ্রাইয়া চৌধুরী, কে. গোপালন কুট্টি, জে. পি. রাও, ভেলুথাট, গঙ্গাধরণ নাম্বিয়ার, এ. মুরলী, ভি. মুরলী, মোহন দাস, রাজেন্দ্র প্রসাদ, নরেন্দ্র পাঞ্জোয়ানী,

মিরিয়াম দোসসাল, মেধা এবং বিজয় লেলে, বিশালাক্ষী মেনন, অ্যান্টনি টমাস এবং জ্ঞানেশ কুদাইসিয়া আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ, সাক্ষাৎকারগুলি নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করার জন্য এবং আলোচনার মাধ্যমে আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যও। আমি আরও একটি বিশেষ ঋণ স্বীকার করতে চাই প্রয়াত আরুতলা রামচন্দ্র রেড্ডির কাছে, তেলেঙ্গানা সংগ্রামের যে প্রবীণ সৈনিক তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়সেও আমাদের তেলেঙ্গানার গ্রামগুলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাঁদের সঙ্গে গভীর আলোচনার মাধ্যমে কয়েক বছর ধরে আমাদের চিন্তাগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তাঁরা হলেন এস. গোপাল, রোমিলা থাপার, মোহিত সেন, কে. এন. পানিক্কর, এস. ভট্টাচার্য, কেবল ভার্মা, পি. সি. যোশী, রবীন্দ্র কুমার, ভি. এন. দত্ত, বরুণ দে, এ. আর. দেশাই, লাজপত জাগগা, ডি. এন. গুপ্ত, বিকাশ চন্দ্র, সঞ্জয় প্রসাদ, সঙ্গীতা সিং এবং রবি বাসুদেবন।

জাতীয় মহাফেজখানা এবং মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, ত্রিবান্দ্রম, বোম্বাই ও পাটনার প্রাদেশিক মহাফেজখানাগুলির অধিকর্তাদের কাছে, তথা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মচারীদের কাছে তাঁদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। অবশ্যই বর্তমানে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে কোনও গবেষণাই নেহরু মেমোরিয়াল মু্যজিয়ম অ্যান্ড লাইব্রেরি-র অধিকর্তা এবং কর্মীদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই সহযোগিতা আমি ও আমার সহকর্মীরা সর্বতোভাবে পেয়েছি। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চের কাছেও, যার অর্থানুকূল্য না পেলে সেই বৃহত্তর পরিকল্পনাটি সম্ভব হতনা, যার একটি অংশ হিসাবে এই ছোট বইটি রচিত হয়েছে।

আমার আগের কাজকর্মের মতই, এই বইটির প্রস্তুতিতেও আমার স্ত্রী উষা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

বিপান চন্দ্র।

সূচীপত্র

১

সূচনা এবং প্রাক্‌কথন

কংগ্রেসের দীর্ঘমেয়াদী গতিসূত্রগুলি বিবেচনা করার আগে আমাদের স্থির করতে হবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঠিক কি ছিল। আমার মতে কংগ্রেস ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। গোড়ার থেকেই ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার, এবং তাদের সক্রিয় ও একত্র করার ভার কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই কাজ মূলত হাতে নেওয়া হয় ১৯১৮ সালের পর। গান্ধীর যুগে জনসাধারণের সংগ্রামশীলতা ও আত্মোৎসর্গের তাগিদ থেকেই জাতীয় আন্দোলন তার সম্পূর্ণ শক্তি লাভ করেছিল। গণতন্ত্রপ্রেমী জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের ক্রিয়াকলাপ হিসেবেই প্রথম শুরু হয় জাতীয় আন্দোলন। কিন্তু পরে তা যুবসম্প্রদায়, মহিলা, শহুরে পাতি-বুর্জোয়া, শহর ও গ্রামের দরিদ্রজন ও শ্রমশিল্পী, তথা কৃষক এবং ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের একটি বড় অংশকে সামিল করতে সমর্থ হয়।

তার বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রতীক এবং প্রধান বাহন ও সংগঠক তথা প্রতিভূ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতালাভ অবধি তাকে এই ভূমিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়।[১] ভালো-মন্দ সব দিক মিলে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনই ছিল ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত এবং ঐতিহাসিকভাবে দৃশ্যত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন।[২] ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জীবনী-শক্তি ও প্রতিভা এই আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল, যেমনটি যে কোনও খাঁটি গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

এই বক্তব্যে জোর দেওয়া দরকার, কেননা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নয়া-ঔপনিবেশিক ধারার ঐতিহাসিকতা প্রায় ধর্মপ্রচারকের আগ্রহ নিয়ে প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের বৈধতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের মুখপাত্র এবং মতাদর্শপ্রণেতারা ১৮৮০-র দশকে যে ঐতিহ্যের

সূচনা করেন, এই প্রবণতা তাকেই অনুসরণ করছে। এই ঐতিহাসিকরা হয় আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্রকে অস্বীকার করেন, অথবা এর বিপরীতে কতকগুলি প্রকৃত বা সম্ভাবনাপূর্ণ বা 'সমান্তরাল' সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারাকে তুলে ধরে ঘোষণা করতে চেষ্টা করেন যে প্রকৃত আন্দোলন ছিল 'একটি ধোঁকা যা ভারতীয় জনগণের সত্যিকারের তাগিদগুলিকে চাপা দিতে চেয়েছিল।' যেমন আইরিশরা, ১৯২৫-এর পর থেকে চীনারা, ১৯১৭-২১ এবং ১৯৪১-৪৫-এর সময় সোভিয়েত জনগণ, ১৯৩৯-৪৫-এ ব্রিটিশরা, অথবা ১৯৪০-৪৪ থেকে প্রতিরোধী ফরাসীরা, তেমনই ভারতীয় জনসাধারণ ও তাদের নেতৃবৃন্দও যে কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে একটি জাতীয় যুদ্ধে লড়াই করায় ব্যাপৃত ছিলেন, এবং এই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন—এটা এই ঐতিহাসিকরা কোনও মতেই মেনে নিতে পারেন না।[৩] এজন্য তাঁরা একথাও মেনে নিতে পারেননা যে উল্লিখিত অন্য আন্দোলনগুলিকে নিরীক্ষার জন্য জাতি, শ্রেণী, উদ্দেশ্য, জনসংগঠন, মতাদর্শ ইত্যাদি যে নিরিখগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলিকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করার জন্যও ব্যবহার করা উচিত।

অবশ্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য অনেকগুলি ধারাও ছিল: ১৮৯৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ, ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকের অকালী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আজাদ হিন্দ ফৌজ, রাজ্যগঠনকামী আন্দোলন (State people's movements), বিভিন্ন আদিবাসী আন্দোলন ইত্যাদি। এদের অনেকগুলিই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে থাকলেও এদের ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ছিল না।[৪] কোনও পর্যায়েই এগুলি জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাটির পরিবর্ত বা বিকল্প হয়ে ওঠেনি।[৫] সংখ্যাগত ও গুণগত বিচারেও কখনোই এরা জাতীয় আন্দোলনের সমপদবাচ্য ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কমবেশী সব শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম ও অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনেই যোগ দিয়েছিল। নিছক একটি দলের পরিবর্তে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠার দরুণ কংগ্রেস তার নিজস্ব পরিধির মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রবণতাগুলিকে সম্মিলিত করতে পেরেছিল।

অতএব ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাক্-১৯৪৭ কংগ্রেসকে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হিসেবে না হলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নিতে হবে।[৬]

এখানে আমি দেখিয়েছি যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাংবিধানিক উদ্যোগের জবাবে একই সূত্রে গ্রথিত কিছু তাৎক্ষণিক আন্দোলন

ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই ছিল না, বরং এর ছিল একটি সুনির্দিষ্ট ও অনুধাবনযোগ্য পরিচালনশৈলী, যার সর্বাগ্রগণ্য প্রণেতা ছিলেন গান্ধী। এই শৈলীর ভিত্তি ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র/রাজ সম্পর্কে এক জটিলবোধ—যেমন এটি বিশুদ্ধ কর্তৃত্বপ্রধান বা স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের থেকে আলাদা ; এটি আধা-প্রভুত্বব্যঞ্জক (রাষ্ট্র), যার ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করছে আইনের অনুশাসন, একটি আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকাঠামো, স্থানীয় সরকার বা আইনসভার (যার অবশ্য রাষ্ট্রশক্তির উপর কোনও কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ নেই) মত পৌর প্রতিষ্ঠান, সুবিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক প্রচারযন্ত্র, এবং স্বাভাবিক সময়ে পৌর স্বাধীনতাগুলির কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ। ব্রিটেনের সমাজ, রাষ্ট্রবিধি ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানও এই রণকৌশল (strategy) রচনায় সাহায্য করেছিল।

এই রণকৌশলের মূল উপাদানগুলিকে সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম (বৃহত্তর পরিসরে), অথবা S-T-S (Struggle-Truce-Struggle), এই সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এই রণকৌশলে বৈধতার সীমাতিগ গণ-আন্দোলনের সময়গুলি অপেক্ষাকৃত 'নিষ্ক্রিয়তা'র সময়গুলির সঙ্গে পর্যায়-ক্রমিকভাবে আসে। এই 'নিষ্ক্রিয়' পর্যায়ে আইনের পরিসরের মধ্যেই পরিচালিত হয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। সংগ্রাম এগিয়ে যায় বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে, এবং কোনও পর্যায়েই সে তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র হারায়না বা পূর্ণস্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না।

এই রণকৌশলে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আদর্শের সংগ্রাম, গণ-চেতনা, এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্যকলাপ। ইতালীয় মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামসূচি অবস্থানের লড়াইয়ের যে রণকৌশলের উপস্থাপনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, এই কৌশলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্ভবত গ্রামসূচি-পরিকল্পিত রণকৌশলের একমাত্র ঐতিহাসিক বাস্তব রূপায়ণ। যে তাত্ত্বিক অগ্রগতি স্বয়ং গ্রামসূচি এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর প্রভাবাধীন মার্ক্সবাদীদের উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে, আমার ও আমার সহকর্মীদের বিশ্লেষণ কাঠামো তাকেই আত্মস্থ করেছে। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তত্ত্বায়ণের (theorisation) দিকে না গিয়েও স্পষ্টতই এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে আত্তীকৃত করেছিলেন, তাঁদের বোধ ও প্রেক্ষিতের (perspective) কাছেও এই কাঠামো সম্যক্‌ভাবে ঋণী। মূল গ্রন্থাংশে স্পষ্ট-ভাবেই বলা হয়েছে যে গান্ধীই ছিলেন এই রণকৌশলের উৎসপুরুষ, যদিও দাদাভাই নওরোজী থেকে লোকমান্য তিলক পর্যন্ত পূর্ববর্তী নেতারাও এর বিবর্তনে সহায়তা করেছিলেন। তার সমসাময়িক দুই মহান

বিপ্লবের রণকৌশলপ্রণেতা লেনিন এবং মাও জে দং-এর মত গান্ধী তাত্ত্বিক সূত্রাবলী প্রণয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেননি। কিন্তু তাঁর রচনা ও সাক্ষাৎকারগুলিতে—বিশেষত ১৯৩৩-৪২ কালসীমার মধ্যে—বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে অসামান্য কিছু রণকৌশলের সূত্র। এগুলিকে তাঁর বাস্তব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগ করলে একটি সুসংবদ্ধ, সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে।

গান্ধীর কৌশলের কেন্দ্রে ছিল জনগণের এবং আন্দোলনকারীদের প্রাণ-শক্তি ও সৃষ্টিশীলতাকে জাগিয়ে তোলা, এবং তার উপর নির্ভর করা।' অহিংসা কোনও ব্যক্তিগত খেয়াল বা জাতীয় আন্দোলনের 'বুর্জোয়া চরিত্রের' পরিণাম ছিলনা। গান্ধীর রণকৌশল এবং বৃহদায়তন গণ-আন্দোলনের উপর এর নির্ভরতার কেন্দ্রে ছিল এর অবস্থান। সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপ এবং গঠন-মূলক কর্মোদ্যোগ এই কৌশলে যে ভূমিকা পালন করেছিল, আমি সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বিশেষভাবে যে দিকগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল : সাংবিধানিক প্রলোভনে প্ররোচিত না হয়েও জাতীয় আন্দোলনের সংবিধানের পরিসরকে ব্যবহার করার ক্ষমতা এবং গঠনমূলক কর্মোদ্যোগের অতীব গুরুত্ব—বিশেষত 'নিষ্ক্রিয়' পর্যায়গুলিতে—যে সময়ে এই ধরণের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসংযোগ স্থাপন ও রক্ষা করা এবং কর্মীদের সৃষ্টিশীল প্রাণশক্তিকে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়ে থাকে।

১৮৮০-র দশকে এর সূচনাকাল থেকেই জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল উপনিবেশবাদ ও ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিকীকরণের (colonia-lization) সমালোচনা, দরিদ্রদের প্রতি আনুকূল্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্য, আধুনিক আর্থিক উন্নয়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও পৌর স্বাধীনতা, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতির উপর ভিত্তি করে। যে ব্যাপারটি একইরকম গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রভাবে আন্দোলনের একটি বামপন্থীধারাও ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে, একাধিক পরস্পর-বিবদমান ধারা সত্ত্বেও আন্দোলন মোটের উপর বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী বিকাশের প্রেক্ষিতের প্রভাবাধীনই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি দেখিয়েছি যে এটি অবশ্যম্ভাবী ছিল না। আন্দোলনের এবং তার প্রধান নেতৃবর্গের বহু বৈশিষ্ট্য ছিল যা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত প্রভুত্বের দিকে এই আন্দোলনের রূপান্তরের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। তা যে শেষ পর্যন্ত ঘটেনি তার জন্য দায়ী ছিল বহু কারণ। যেমন, বামগোষ্ঠী গান্ধীবাদের রণকৌশল ও মতাদর্শের কাঠামোকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। এগুলির সঙ্গে সৃজন-শীল ও অর্থপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যর্থতার ফলে বামগোষ্ঠীর পক্ষে এগুলিকে

একই সঙ্গে আত্তীকরণ ও পরিবর্ধন করা, এবং অবশেষে এগুলিকে অতিক্রম করে আন্দোলনকে একটি সমাজতান্ত্রিক চরিত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি।

উপসংহারে দেখানো হয়েছে যে সমাজ রূপান্তরের আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক, আধা-গণতান্ত্রিক, বা গণতান্ত্রিক ধাঁচের প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্র বা সমাজগুলিতে রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তনকামী আন্দোলনের পক্ষে ভারতীয় সংগ্রাম বা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের এবং বিশেষত এর রণকৌশল পরিচালনার, অভিজ্ঞতার একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য আছে। সেই অর্থে এই তাৎপর্য ব্রিটিশ, ফরাসী, রুশ, চীনা, কিউবান ও ভিয়েতনামী বিপ্লবের তাৎপর্যের সঙ্গে তুলনীয়।

সূত্র নির্দেশ

১. প্রাক্‌-১৯৪৭ কংগ্রেস এবং ১৯৪৭-উত্তর কংগ্রেসকে অবশ্যই আলাদা করে দেখা দরকার। ১৯৪৭-এর পরে কংগ্রেস ক্রমশ একটি নিয়মিত রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় এবং একটি ভিন্ন চরিত্র, শ্রেণীগত ব্যঞ্জনা, নেতৃত্বের ধারা ইত্যাদি অর্জন করে।

২. ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে জয়প্রকাশ নারায়ণ জাতীয় দাবিসমূহের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার প্রস্তাবনায় এই ব্যাপারটির একটি সুন্দর সারাংশ দেওয়া হয়: "অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছে এবং তাদের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিগত দুই দশক ধরে সে ভারতীয় জনগণের হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে এবং জনসাধারণের ক্লেশ, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্য, অর্থাৎ স্বাধীনতার পথে দেশকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে"। Tendulkar, *Mahatma*, Vol. 5, পৃ. 65-তে উদ্ধৃত।

৩. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, Gandhi, *Collected Works*, Vol, 68, পৃ. 240-1. কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে গান্ধী প্রায়ই যুদ্ধের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন।

৪. দ্রষ্টব্য, Bipan Chandra, et. al., *Economic and Political Weekly*, 6 May 1984.

৫. একমাত্র যে আধুনিক বৃহদায়তন গণ আন্দোলনগুলিকে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ধারার (অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতির নয়) অংশ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, সেগুলি হল সাম্প্রদায়িক এবং জাতপাতের আন্দোলন। চরিত্রে এগুলি জাতীয়তাবাদী ছিল না, এবং হয় আগে নয়তো পরে অমোঘভাবে এগুলির মধ্যে রাজানুগত্য এবং উপনিবেশবাদের প্রতি সমর্থনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আমার *Communalism in Modern India*, Chapter-4 দেখুন।

৬. একই জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে রুশ বিপ্লব প্রসঙ্গে বলশেভিক পার্টি ও লেনিনের উপর আলোচনায় এবং চীন বিপ্লবপ্রসঙ্গে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি ও মাও জে-দং-এর ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনায়।

২

আদর্শগত ও কার্যসূচিগত গতিসূত্র

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ছিল মূলত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় বা প্রাথমিক বৈপরীত্য, অর্থাৎ উপনিবেশবাদ এবং ভারতীয় জনস্বার্থের অসঙ্গতির ফলাফল। এই ছিল তার বস্তুগত ভিত্তি। জাতীয় আন্দোলন এই প্রাথমিক বৈপরীত্য সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা অর্জন করেছিল এবং তাকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল—বস্তুত এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত আছে তার প্রাথমিক দীর্ঘমেয়াদী গতিসূত্র। এছাড়াও, উপনিবেশবাদের শিকার হিসেবে ভারতবাসীর সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং ভারতীয় জনগণের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে তার সম্যক্ উপলব্ধি ছিল। এগুলির ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলন ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সার্বিক বোধ অর্জন করেছিল, এবং ক্রমে ক্রমে একটি সুস্পষ্ট উপনিবেশবাদ-বিরোধী মতাদর্শকে সৃষ্টি করে তাকে সুবিন্যস্ত আকার দিয়েছিল। উপনিবেশবাদ এবং ভারতীয় সমাজের প্রাথমিক বৈপরীত্যগুলির সম্পর্কে, আন্দোলন একটি সুস্পষ্ট জাতীয় বিজ্ঞানসম্মত ও দৃঢ়ধারণা ও বিশ্লেষণের সৃষ্টি করেছিল এবং ভারতীয় জনসাধারণের কাছে সেটিকে দৃশ্যমান করে তুলেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অংকুরোদ্গমকাল, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ পাদেই জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টাপুরুষরা একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছকে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন ঔপনিবেশিক উদ্বৃত্তশোষণের তিনটি উপায় সম্পর্কেঃ (ক) সরাসরি কর ব্যবস্থার, লুণ্ঠন এবং প্রচুর সংখ্যক ইংরেজের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে; (খ) ভারতবর্ষকে কাঁচামাল উৎপাদন ও বিক্রি এবং মেট্রোপলিটান শিল্পদ্রব্য ক্রয়ের জন্য, অর্থাৎ অসম-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে; (গ) ব্রিটিশ-মালিকানাধীন পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে। ধননিষ্কাশন তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে তাঁরা উপনিবেশিক উদ্বৃত্তশোষণের সামগ্রিক 'কার্যপ্রণালী'টিকে স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া, তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজকে ব্রিটিশ অর্থনীতি

ও সমাজের প্রয়োজনগুলির বশংবদ করে তোলার মধ্যেই ঔপনিবেশবাদের সারাৎসার। আর বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের উপনিবেশিক সম্পর্ক কোনও ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা বা রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণের ফল নয়, বরং তা ব্রিটিশ সমাজের এবং তার প্রতি ভারতের অধীনাবস্থার চরিত্র থেকেই সঞ্জাত।[১] সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসারের প্রভাবে ১৯১৮ সালের পর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের জটিল অর্থ-নৈতিক কার্যপ্রণালী সম্পর্কে এই বোধ আরও প্রসারিত হয়। জাতীয় নেতৃবর্গও বুঝতে পারেন যে একমাত্র ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক সম্পর্ক-গুলির রূপান্তর (নরমপন্থীদের বিশ্বাস) বা ধ্বংসের মাধ্যমেই এই কেন্দ্রীয় বৈপরীত্যের সমাধান সম্ভব। এছাড়াও, এর বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে এর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ উপনিবেশবাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে প্রতি-উপনিবেশবাদ-নির্ভর বৈদেশিক নীতির বিকাশ এই উপনিবেশবাদ-বিরোধী বিশ্বদর্শনকে আরও জোরদার করেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই উপনিবেশবাদ-বিরোধী বিশ্বদর্শনকে জাতীয় আন্দোলনের নিম্নতম অংশীদাররা যেমন আত্মস্থ করেছিল, তেমনই করেছিল ভারতীয় জন-সাধারণের বৃহৎ বৃহৎ অংশও।[২] এইভাবে এই প্রাথমিক বৈপরীত্য জাতীয় আন্দোলনের বস্তুগত অথবা কাঠামোগত ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল, আর এর মতাদর্শগত ভিত্তি গড়ে উঠেছিল প্রতি-ঔপনিবেশিক আদর্শের মাধ্যমে এই বৈপরীত্যের উপলব্ধির উপর। এর ফলে একটি সুদৃঢ় এবং সুষম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পথ সুগম হয়। এই আন্দোলনের শিকড় প্রতি-ঔপনিবেশিক আদর্শের মধ্যে প্রোথিত ছিল, এবং এটি এই আদর্শের অনুগামী ছিল বলেই এর পক্ষে একটি অত্যন্ত নমনীয় কার্যপ্রণালী মেনে চলা সম্ভব হয়েছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন কেন সাম্রাজ্যবাদের কাছে দুর্বলতা প্রদর্শন বা নতিস্বীকার করেনি—যেমনটি করেছিল ১৯১১ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে চীনের আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর জঙ্গী মনোভাবাপন্ন আন্দোলনগুলি—তার আংশিক ব্যাখ্যাও এরই মধ্যে নিহিত। এর ফলে, যখন দাদাভাই নওরোজী, রানাডে, ফিরোজশাহ্ মেহ্তা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং জি. কে. গোখেলের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের রাজনীতি ছিল অত্যন্ত মৃদুপন্থী, তখনও এর পূর্ণ আনুগত্য লাভ করা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছে দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।[৩] অন্যদিকে, উপনিবেশিক শাসনের মতাদর্শগত ভিত্তিটি আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনের উত্থান অমোঘ এবং শুধুমাত্র সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে, যে-কোনও গণ-আন্দোলনের গতিসূত্রের একটি মৌল উপাদান হিসেবে মতাদর্শের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া দরকার। ভূমি (base) ও অতিকাঠামোর (superstructure) সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক গতিসূত্রের বিচারে একটি আন্দোলন একটি নিশ্চল রাজনৈতিক অবস্থার থেকে অনেক আলাদা। তৃতীয় জর্জের রাজত্ব বা ট্যামানি হল বা মেয়র ড্যালের (Daley) শিকাগো, মিঃ রেগন, মিসেস থ্যাচার অথবা আজকের বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুর গোষ্ঠীগত রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সাহায্যে ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব বা এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার (যেমন চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ, আলজিরিয়া, কিউবা বা নিকারাগুয়া) জাতীয় গণ-মুক্তি আন্দোলন, অথবা যুগোস্লাভিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, বা ওয়ারস'র ঘেটো (Ghetto) বা অধিকৃত ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির জাতীয় গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনের রাজনীতিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যদিচ, আমাদের মনে হয় যে এমনকি প্রথমোক্ত উদাহরণগুলির ক্ষেত্রেও প্যারেটো, মোস্কা এবং অবয়ববাদ-সংঘাতবাদের (structuralism-functionalism) বিশ্লেষণী পদ্ধতিগুলি মূলগতভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

যে কথাটি আরও জরুরী, সেটি হল এই যে মতাদর্শ এবং মতাদর্শগত প্রস্তুতি যে কোনও ধরণের গণভিত্তিক সংগ্রামেই গুরুত্বপূর্ণ; অবশ্য প্রভুত্বকামী সংগ্রামে (hegemonic struggle)—যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ছিল বলে আমরা দেখাতে চাইছি—তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বস্তুগত উপকরণের ভূমিকা এখানে গৌণ, এবং পরিস্থিতিনির্বিশেষে তা প্রতিপত্তিশালী পক্ষের হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাছাড়া, যে কোনও ক্ষেত্রেই জনসাধারণের সর্বাগ্রে জানা দরকার তার শত্রু কে, এবং কেন্দ্রীয় বৈপরীত্যটি কি। তাছাড়াও, নিষ্ক্রিয় সমর্থন বা প্রতিরোধ অথবা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদান হল এক জিনিস; কিন্তু প্রভূত ত্যাগ-নির্ভর যে সক্রিয় প্রতিরোধ, তার উৎস কেবলমাত্র শোষণ বা শোষণের একটি ধারণা বা চেতনার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে না। এরজন্য আদর্শগত দায়বদ্ধতা খুব জোরদার হওয়া দরকার।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের একটি মৌল উপাদান হিসাবে মতাদর্শের ভূমিকাটিকে অনেক পণ্ডিতই যে আজকাল হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, তার একটি কারণ হল এই যে তাঁদের নিজেদের সমাজেই জাতির সাধারণ স্বার্থের পরিধিটি কয়েক দশক ধরে ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। ফলত, তাঁদের সমাজে শাসকশ্রেণী এবং তার মতাদর্শপ্রণেতারা প্রায়শই জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করেছেন নিছক একটি 'আদর্শ' অথবা অলীক-

চৈতন্য বা জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবার একটি উপায় হিসাবে। কিন্তু উপনিবেশবাদের জন্য তথা বিরুদ্ধে, এবং [পূর্বোল্লিখিত] প্রাথমিক বা কেন্দ্রীয় বৈপরীত্যের কারণে, ঔপনিবেশিক সমাজে এই ধরণের জাতীয় সাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। এখানে জাতীয়তাবাদী (বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা জাতীয় মুক্তিকামী) মতাদর্শ ইতিহাসের একটি চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে, কারণ একমাত্র জাতীয়তাবাদী, প্রতি-ঔপনিবেশিক মতাদর্শের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় বৈপরীত্যের সমাধান এবং জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব। একই কারণে এই কেন্দ্রীয় বৈপরীত্য এবং জাতীয়তাবাদী, প্রতি-ঔপনিবেশিক মতাদর্শকে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন না করলে কারও পক্ষেই একটি উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে বিন্দুমাত্রও বোঝা সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক জনসাধারণের, এক্ষেত্রে ভারতীয় জনতার, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আবির্ভাব ও বিস্তারে এই কেন্দ্রীয় বৈপরীত্য এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মতাদর্শ যে কেন্দ্রীয় কার্যকারী (causative) ভূমিকা পালন করে। নয়া-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা তাকে অস্বীকার না করলেও অবজ্ঞা করে। বস্তুত এখানেই এই চিন্তাধারার মূল দুর্বলতা—যে কারণে একে নয়া-ঔপনিবেশিক বলে অভিহিত করতে হয়। অনিবার্যভাবেই এই ধারার পন্ডিতেরা যে বক্তব্যের শরণাপন্ন হন তা হল : 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল একটি মিথ্ যার অন্তরালে নিতান্ত দলবাজি, পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা (collaboration) ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।'

(২)

এই প্রতি-ঔপনিবেশিক বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও অন্য কয়েকটি মতাদর্শগত উপাদান ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কার্যসূচিগত গতিসূত্রটি রচনা করেছিল। এগুলিই গড়ে দিয়েছিল জাতীয় নেতৃবর্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সাধারণ দর্শন। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, এই দর্শনে বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশ এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক, পৌর স্বাধীনতাসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, উভয় ব্যবস্থারই প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ছিল সামাজিক সাম্যের নীতির ভিত্তিতে। এটা কৌতূহলের বিষয় যে ১৯৪৭ পর্যন্ত (এমনকি আজ অবধি) এই দর্শন নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি ; যাবতীয় প্রশ্ন ও বিতর্ক [আলোচিত] অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুঁজিবাদী চরিত্রের সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সংসদীয় গণতন্ত্র এবং পৌর স্বাধীনতার প্রতি জাতীয় আন্দোলন ছিল

সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।[৪] এই আন্দোলন যে জমি ও পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল তাতেই এই দুই আদর্শ গভীরভাবে প্রোথিত করেছিল তাদের শিকড়। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ধারায় সংগঠিত হয়েছিল। সংবাদপত্র, বক্তব্য ও সম্মেলনের স্বাধীনতা ছাড়া অন্যান্য পৌর স্বাধীনতার উপরেও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে আঘাত এসেছিল, তার বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই জাতীয়তাবাদীরা প্রতিটি পদক্ষেপে সংগ্রাম করেছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যকালীন কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির ইতিহাসে উজ্জ্বলতম দিকগুলির অন্যতম ছিল পৌর স্বাধীনতার ব্যাপক ও দৃশ্যত প্রসার। বস্তুত যতটা না ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমেই পৌর স্বধীনতা, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সম্পর্কিত সংসদীয় প্রথাগুলির দেশজকরণ হয়েছিল। অন্যদিকে পৌর স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিকে গভীরতর করেছিল এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রভুত্বকামী রণকৌশলের বিবর্তনের পথ প্রস্তুত করেছিল।

গোড়ার থেকেই জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের একটি মৌলিক উপাদান ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জাতিভিত্তিক শোষণের (caste oppression) বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং ১৯২০ সালের পর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে জাতীয় আন্দোলনের কার্যসূচী ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি মৌল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। নারীদের সমস্যাগুলি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। সমাজের উচ্চনীচ ভেদাভেদগুলির উপর এসেছিল সার্বিক আক্রমণ। ভারতীয় জনগণের বহুমুখী বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেওয়া হয়। জাতি হিসাবে পরিণত এবং সুনির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট না হলেও ভারতবর্ষ যে একটি নির্ণীয়মান জাতি—এই ব্যাপারটি শুধু যে স্বীকৃত হয়েছিল তাই নয়, একে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল মতাদর্শগত কাজকর্ম ও আন্দোলন। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্যসাধনের নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়াটির অবদান স্পষ্টই দেখা গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হোক তা নরমপন্থীরা চায়নি এবং এই কারণেই অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের তীব্র সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশ শাসনের অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম সমর্থন করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি সার্বজনীন অধীনতা যে জাতি-গঠনের বস্তুগত ও মানসিক ভিত্তি গড়ে দেয়, তা অনুধাবন করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এও চিন্তা করা হয়েছিল যে জাতীয় আন্দোলনের সূচনালগ্নে যেহেতু 'জাতি' নামক উপাত্তটির অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং আন্দোলনের অন্যতম কাজই হবে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সার্বিক

সংগ্রামের মাধ্যমে একটি জাতি গড়ে তোলা। আন্দোলনের রাজনৈতিক তথা মতাদর্শগত ক্রিয়াকলাপ যে এই জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই সচেতনতাও ছিল। সেই সঙ্গে এও স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে আঞ্চলিক, ধর্মীয়, বর্ণীয়, নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত যাবতীয় বিভিন্নতার কথা সম্পূর্ণ স্মরণে রেখেই ভারতীয় জনগণকে একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে হবে। বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক উচ্চাকাঙ্খাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

আধুনিক শিল্প ও কৃষির ভিত্তিতে ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়াও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষত বৈদেশিক পুঁজির কবল থেকে মুক্তি, একটি নিজস্ব বৃহদায়তন শিল্প-পণ্যের উৎপাদনক্ষেত্রের সৃষ্টি এবং স্বনির্ভর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠার উপর এরা গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তিরিশের দশকের শেষের দিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ব্যাপক এবং সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। গান্ধীযুগে এই লক্ষ্যগুলির প্রতি আদর্শগত আনুগত্য দুর্বলতর হয়নি, বরং দৃঢ়তর হয়েছিল—যদিও মনে রাখা দরকার যে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতি গান্ধীর মনোভাবকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বারবার বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প মানুষের কায়িক শ্রমকে উচ্ছেদ করার পরিবর্তে তার ভার লাঘব করে—এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়—ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এর বিরোধী নন।[৫]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গতিসূত্রের আরেকটি শক্তিশালী দিক ছিল কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের বিশ্ববীক্ষা। বহু বছর ধরে জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বস্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলির সঙ্গে সমস্বার্থতা প্রকাশ ও স্থাপনের নীতি নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৭০-এর দশক থেকে তাঁরা ব্রিটিশ জনজীবনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংশগুলির সঙ্গে ঐক্যস্থাপন এবং তাদের সমর্থন লাভ করতে চেষ্টা করেন। সেইসঙ্গে ভারতবাসীর ঘৃণা যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি, ব্রিটিশদের প্রতি নয়, এই ধারণাটিও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। [সাম্রাজ্যবিস্তারকারী জাতকে ঘৃণা না করার এই নীতি জাতীয় আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী নৈতিক অবলম্বন দিয়েছিল। এইজন্য, প্রশাসনযন্ত্রের সদস্যরা যখনই সত্যাগ্রহগুলিকে হিংস্র উপায়ে দমন করত, তখনই তারা নিজেদের চোখেই অনেকখানি ছোট হয়ে যেত। আবার এইজন্যই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কোনওরকম 'বিপরীত' জাত্যাভিমানে (racism) অধঃপতিত না হয়ে সুদৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মধ্যেই প্রোথিত রয়ে গিয়েছিল।]

আবার জাতীয়তাবাদীরা হিন্ডম্যান এবং লেবার পার্টির বামগোষ্ঠী থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী, কংগ্রেস, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগ, সোভিয়েত-ইউনিয়ন এবং কমিনটার্ন পর্যন্ত বিশ্বের প্রগতিশীল উপনিবেশ-বাদ—তথা পুঁজিবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গেও সাধারণ যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেস এক সুস্পষ্ট ফ্যাশিবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল, এবং ইথিওপিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইহুদী জনসাধারণের ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরবদের এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। বিশের দশকে কংগ্রেস ভারতীয় সৈন্যদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চীনের বিপ্লবকে দমন করতে নিষেধ করেছিল এবং এর পরের দশকে বারবার ভারতীয়দের জাপানী দ্রব্য বয়কট করতে বলেছিল।

(৩)

গোড়ার থেকেই জাতীয় আন্দোলন যে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছিল, এই ব্যাপারটি ছিল তার গতিসূত্রের মূলে। তার দ্বারা গৃহীত সংস্কার-পরিকল্পনা সমসাময়িক বিচারে যথেষ্ট মৌলিক এবং মূলত জনমুখী ছিল। যে সংস্কারগুলি জাতীয় আন্দোলন দাবী করেছিল তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্র ও নিম্ন মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর উপর কর হ্রাস, লবণ কর, ভূমিরাজস্ব ও খাজনার হ্রাস, কৃষিজীবীদের জন্য ঋণমকুব (debt relief) এবং সুলভে কর্জের ব্যবস্থা, রায়তদের অধিকার রক্ষা, শ্রমিকদের জীবিকানির্বাহোপযোগী মজুরী এবং হ্রস্বতর শ্রমদিবসের অধিকার, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের পুলিশ প্রভৃতি স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ হবার অধিকার, গ্রামীণ শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, নারীদের সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, তাদের কর্ম, শিক্ষা এবং সমান রাজনৈতিক অধিকারের সংস্থান, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থাগ্রহণ এবং আইন ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রশাসন-যন্ত্রের সংস্কারসাধন।

যে ব্যাপারটি একইরকম গুরুত্বপূর্ণ, তা হল এই, যে কোনও পর্যায়েই কংগ্রেস তার তৎকালীন চরিত্রে সন্তুষ্ট থাকেনি। এর গণমুখী দিকটি ক্রমাগত র‍্যাডিক্যাল চরিত্র অর্জন করতে থাকে। ক্রমশই, বিদেশী শাসনের অনুপস্থিতি, এই পরিধিকে ছাপিয়ে গিয়ে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছিল আর্থ-সামাজিক মাপকাঠিতে। তিরিশের দশকের শেষ দিকের মধ্যেই ভারতীয়

জাতীয় আন্দোলন সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাদাভাই নওরোজী থেকে শুরু করে, গান্ধীর আগমন এবং বিশ ও তিরিশের দশকের শেষের দিকে একটি প্রভাবশালী বাম-গোষ্ঠীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এর দরিদ্রপ্রেমী দিকটি রীতিমত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল করাচী, লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুরের প্রস্তাবনায় তথা ১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনী ইস্তাহারগুলিতে, এবং আংশিক প্রতিফলন ঘটেছিল কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে এমনকি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় মূলগত পরিবর্তনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। এমনকি করাচী প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতির দ্বারা অনুমোদিত শ্রেণীযুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবনাও টিঁকে যায়।[৬] গান্ধীর মধ্যে একটি র‍্যাডিক্যাল দিকের বিকাশ এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য 'লক্ষ লক্ষ মেহনতী ও বেকার মানুষ, যারা কোনোদিন ঠিকমত খেতেও পায়না এবং একটুকরো বাসি রুটি ও এককণা নুন দিয়ে যাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়', তাদের দুর্দশা লাঘব করাই ছিল তাঁর জীবনকর্ম।[৭] তাঁর যাবতীয় গঠনমূলক কর্মোদ্যোগই নির্দিষ্ট ছিল গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। ১৯৩৩ সালে তিনি নেহরুর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে 'কায়েমী স্বার্থের বস্তুগত পরিবর্তন ছাড়া জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়', এবং যে 'আমাদের পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মেলানো উচিত।'[৮] সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ছিল কৃষি-সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তাঁর র‍্যাডিক্যাল দিকে সরে আসা। ১৯৩৭-এর শেষে তিনি বলেছিলেন ঃ[৯]

> আমাদের হাতে প্রকৃত সমাজতন্ত্র তুলে দিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, যাঁরা শিখিয়েছিলেন ঃ "সব জমিই যখন গোপালের, তখন এর সীমারেখা কোথায়? মানুষই এই সীমানার স্রষ্টা, সুতরাং সেই তা ভাঙতে পারে।" গোপালের আক্ষরিক অর্থ মেষপালক; এই শব্দটি ঈশ্বরকেও বোঝায়। আধুনিক ভাষায় এর অর্থ রাষ্ট্র, অর্থাৎ জনসাধারণ। এটা খুবই সত্যি যে জমি আজ জনসাধারণের নয়। কিন্তু শিক্ষাটির মধ্যে কোনও ভুল নেই। এটি আমাদেরই, যারা এর যোগ্য হতে পারিনি। আমি নিঃসন্দেহ যে এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আমরা এমন এক পন্থা অবলম্বন করতে পারি যা রাশিয়াসহ অন্যান্য জাতির [দ্বারা অবলম্বিত পথের] থেকে কোনও অংশে নিকৃষ্ট হবেনা এবং উপরন্তু অহিংস হবে……জমি এবং যাবতীয় সম্পত্তি তারই যে তা খাটাবে। দুর্ভাগ্যবশত, হয়

শ্রমিকরা এই সরল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা তাদের অজ্ঞ রাখা হয়েছে।

একইভাবে ১৯৪২-এর জুন মাসে লুই ফিশার যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন: "কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আপনার পরিকল্পনা কি?" তখন গান্ধী জবাব দেন, "কৃষকরা জমি নিয়ে নেবে। নেওয়ার জন্য আমাদের তাদের বলতে হবে না। তারা নিয়ে নেবে।" ফিশার যখন জিজ্ঞাসা করেন, "ভূস্বামীদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে?" গান্ধী বলেন, "না। সেটা আর্থিকভাবে অসম্ভব।" ফিশার প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, আপনার আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনকে আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন?" গান্ধী জবাব দেন, "গ্রামগুলিতে কৃষকেরা কর দেওয়া বন্ধ করবে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা লবণ তৈরী করবে…তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে জমি ছিনিয়ে নেওয়া।" "সহিংসভাবে?" ফিশার প্রশ্ন করেন। উত্তরে গান্ধী বলেন, "হিংসা আসতে পারে, কিন্তু আবার জমিদাররা সহযোগিতাও করতে পারে…পালিয়ে গিয়ে তারা সহযোগিতা করতে পারে।" ফিশার বলেন যে ভূস্বামীরা "হিংসাত্মক প্রতিরোধ সংগঠিত করতে পারে।" গান্ধীর জবাব ছিল, "দিন পনেরোর জন্য বিশৃংখলা হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা শীঘ্রই তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব।" ফিশার প্রশ্ন করেন যে এর অর্থ কি ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমির বাজেয়াপ্তকরণ? গান্ধী বলেন, "নিশ্চয়ই। ভূস্বামীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।"[১০]

এছাড়া আরও বলা যায় যে গান্ধীর মূলগত এবং ক্রমবর্ধমান র‍্যাডিক্যাল মনোবৃত্তিটি ঐতিহাসিকদের এবং সমসাময়িক র‍্যাডিক্যালদেরও সঠিকভাবে বোধগম্য হয়নি, কেননা ইওরোপীয় উদারপন্থী-শ্রমিকদলীয় র‍্যাডিক্যালদের চেয়ে তাঁর প্রকাশভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু তাঁর বক্তব্য বুঝতে তাঁর অনুগামীদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। নিম্নতম স্তরের গান্ধীবাদী কর্মীদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক দিক থেকে গান্ধীর মধ্যে একটি র‍্যাডিক্যাল মানুষ দেখেছিলেন বলেই তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।[১১] ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে সমাজতন্ত্রী এবং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে র‍্যাডিক্যাল অর্থনৈতিক কার্যসূচীর প্রশ্নে এঁদের বড় কোনও পার্থক্য ছিলনা, ছিল অহিংসার প্রশ্নে।

নেহরু, সুভাষ, সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি—যেগুলি তিরিশের দশকে জাতীয় কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী, বর্ধিষ্ণু ও মৌলিক সংগঠক উপাদান ছিল—তাদের হাতে দরিদ্রপ্রেমের দিকটি জাতীয় আন্দোলনকে যুগপৎ গতিময়তা এবং তীক্ষ্নতা দিয়েছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে: পৌর স্বাধীনতাসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক, ধর্ম-

নিরপেক্ষ, মৌলিক সমাজপরিবর্তনবাদী, অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল, স্বাধীন এবং ঐক্যবন্ধ শাসনব্যবস্থার স্বপ্ন, প্রতি-ঔপনিবেশিক মতাদর্শ এবং র‍্যাডিক্যাল দরিদ্রপ্রেম—এই উপাদানগুলি একত্রে কংগ্রেসকে সাহায্য করেছিল জাতীয় আন্দোলনকে জনসাধারণ এবং গণসমর্থনের উপর দাঁড় করাতে এবং একে একটি জনমুখী গণ-আন্দোলনের চরিত্র দিতে।

সূত্র নির্দেশ

১. তাঁরা সম্ভবত ছিলেন উপনিবেশবাদের একটি বিশদ অর্থনৈতিক সমালোচনার সর্বপ্রথম প্রণেতা। সুনিশ্চিতভাবেই, এ ব্যাপারে তাঁরা হবসন ও লেনিনের পূর্ববর্তী ছিলেন।

২. কৃষকরা যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে বুঝত এবং মর্যাদা দিত, তা ১৯৩২ সালে ইণ্ডিয়া লীগের যে প্রতিনিধিবর্গ গ্রামাঞ্চলে সফর করেছিল তাদের রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সাইমন কমিশন ভেবেছিল যে ভারতীয় জনসাধারণ গান্ধীর মত নেতাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল, 'বিমূর্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারা'র প্রতি নয়। এই বোধকে খণ্ডন করে ইণ্ডিয়া লীগের প্রতিনিধিবর্গ লেখেন: "গ্রামাঞ্চলের জাগরণের জন্য গান্ধী, আবদুল গফফর খান, বল্লভভাই প্যাটেল, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, জওহরলাল নেহরু, কেলাপন প্রমুখ ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে বহুলাংশে দায়ী। কিন্তু এই ব্যক্তিরা তথ্যাদি এবং ধারণার উপর নির্ভর করেই তাদের আবেদন পেশ করেছেন··· আমরা নিজেরা বহু জায়গায় পরীক্ষা করে দেখেছি গ্রামবাসী বিষয়গুলির গুরুত্ব কতটা বুঝেছিল···আমরা দেখতে পাই যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলির আবেদন বেশ তীব্র। দারিদ্র্য, করারোপণ (taxation), বৈদেশিক শোষণ, শিক্ষাব্যবস্থার অবহেলা এবং অন্যান্য বিষয়, যাদের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে ভারতবাসীর প্রতিরোধ, সেগুলির সম্পর্কে আমরা শুনি। আমরা দেখতে পাই যে কংগ্রেস কিসের জন্য লড়ছে তা গ্রামবাসীরা জানে এবং দেশের সামনে যে দারিদ্র তার বিশালত্ব সম্বন্ধে তাদের কোনও বিভ্রম নেই···স্বরাজ, এবং কেন তারা তা চায় সে সম্পর্কেও আমরা কথাবার্তা বলি। স্কুল, রাস্তাঘাট, এবং অন্যান্য সুবিধার সংখ্যা বেশি হলে, অথবা করের বোঝা লাঘব হলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে, এবং স্বরাজের জন্য লড়াই যে নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক কাজ, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা তাদের বেশ বিশদভাবে বাতলে দিই। আমাদের আশা ছিল যে এগুলি তাদের বেশ মনে ধরবে এবং আমরা শুনব যে আমরা যে ধরনের বস্তুগত উন্নয়নের কথা বললাম, সেটিই তারা প্রকৃতপক্ষে চায়। তার পরিবর্তে একজন মধ্য-এক সক্রিয় কৃষিজীবী—আমাদের বললেন যে স্বরাজের অর্থ হল আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা, আত্মশক্তি। তিনি এ ব্যাপারেও সুনিশ্চিত ছিলেন যে 'আত্মশক্তি' ছাড়া যে শর্তগুলির কথা আমরা বললাম, সেগুলি অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।" India League Delegation-এর প্রতিবেদন, A. R. Desai, *Peasant Struggles in India*, পৃ. 305-6-তে 'Village Repression by British Rulers' রূপে পুনর্মুদ্রিত।

৩ অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সরকার যে শুধু ১৯০৭ সালে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবিগুলি সহজেই মেনে নিয়েছিল তাই নয়, নীল-বিদ্রোহ, পাবনা-বিদ্রোহ, এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষক-অভ্যুত্থানের (Deccan Agrarian Riots) সঙ্গে জড়িত জঙ্গী কৃষকদের শ্রেণীগত দাবিগুলিকেও মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রশমিত করেছিল।

৪. পৌর স্বাধীনতার প্রতি নেহরুর আনুগত্য সুপরিচিত। গান্ধীর একটি উদ্ধৃতি, "অহিংসা পালনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পৌর স্বাধীনতাই স্বরাজের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এটি হল রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রাণবায়ু, স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর। এখানে আপোস বা রফার কোনও স্থান নেই। এ হল জীবনবারি। জলকে লঘু বা আরও তরল করা যায় বলে আমি কখনও শুনিনি।" *Collected Works*, Vol. 69, পৃ. 356. পৌর স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞার জন্য দেখুন, তদেব, পৃ. 402.

৫. যেমন, ১৯৩৮-এর শেষে তিরিশজন অর্থনীতিবিদ্ গান্ধীর সঙ্গে তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। "আপনি কি বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার বিরোধী?" প্রশ্ন করেন তাঁরা। গান্ধী উত্তর দেন "আমি কখনোই তা বলিনি। এই মতটি হল আমার সম্পর্কে চালু বহু কুসংস্কারগুলির মধ্যে একটি। এই ধরণের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতেই আমার অর্ধেক সময় চলে যায়। বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আমি আর একটু বেশি বিচারবুদ্ধি আশা করি। আপনাদের প্রশ্নের ভিত্তি হল সংবাদপত্রের অযথার্থ বিবরণ ইত্যাদি। যে সব জিনিস গ্রামবাসীরা বিনা অসুবিধায় নিজেরাই বানাতে পারে, আমি সেগুলিরই বৃহদায়তন উৎপাদনের বিরুদ্ধে।" তখন তাঁরা প্রশ্ন করেন, "আপনি কি মনে করেন কুটিরশিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্পের সহাবস্থান সম্ভব?" "হ্যাঁ", উত্তর দেন গান্ধী, "যদি তারা গ্রামাঞ্চলের সাহায্যার্থে পরিকল্পিত হয়। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাদের কেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে…ধরা যাক কাগজ শিল্প যদি রাষ্ট্রায়ত্ত এবং কেন্দ্রায়িত হয়, তাহলে আমি আশা করব যে গ্রামীন শিল্পের দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত কাগজকে তা রক্ষা করবে।" *Collected Works*, Vol. 68, পৃ. 258-59.

৬. Tendulkar, প্রাগুক্ত (*op.cit.*), Vol. 3, পৃ. 277.

৭. Gandhi, *Socialism of My Conception*, পৃ. 255.

৮. *Collected Works*, Vol. 55, পৃ. 427.

৯ তদেব (*Ibid.*), Vol. 64, পৃ. 192.

১০. *Collected Works*, Vol. 76, পৃ. 437, 445-6.

১১. উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার: ছোটুভাই গোপালজী দেশাই, পুনি, বারদোলি, গুজরাট ২৫.৬.১৯৮৫ এবং ছোটুভাই নাথুভাই রাঠোর, খোজ, বারদোলি, গুজরাট, ২৪.৬.১৯৮৫। নেহরু ছিলেন আরেকজন র‍্যাডিক্যাল যিনি এই ব্যাপারটি বুঝতেন। লক্ষ্ণৌতে ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে এক ভাষণে তিনি "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং দারিদ্রপীড়িত ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য গান্ধীর প্রগাঢ় ও সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার" কথা উল্লেখ করেন। S. Gopal, ed., *Selected Works*, Vol. 7, পৃ. 195.

৩

সমরকৌশল

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতিসূত্রের একটি প্রধানদিক ছিল ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী সংগ্রামে তার দ্বারা গৃহীত সমরকৌশল। শুধুমাত্র শোষণ ও প্রভুত্ববিস্তার এবং সে সম্পর্কে জনতার বোধদয়ের উপরেই জনগণের সংগ্রাম করার ক্ষমতা নির্ভর করেনা। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আরও নানা প্রশ্ন, যেমন সংগ্রামের প্রকৃত মূল্য, অথবা সম্ভাব্য মূল্য সম্পর্কে জনগণের ধারণা, সংগ্রামের কার্যপ্রণালী ও সমরকৌশল ইত্যাদি। সংগ্রাম-ক্ষমতার বিকাশে সমরকৌশলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সফল সমরকৌশলকে অবশ্যই বাস্তবে এবং আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব (feasible) ও কার্যকরী হতে হবে, এবং জনসাধারণের মূল্য দেবার ক্ষমতাকে মাথায় রাখতে হবে।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত প্রায় কোনও আলোচনাতেই আন্দোলনের সামগ্রিক সমরকৌশলের উপর নজর দেওয়া হয়নি। এর থেকে মনে হতে পারে যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের আদৌ কোন সমরকৌশলই ছিলনা। যাই হোক, আমরা বিশ্বাস করি যে এই দুর্বলতার জন্য দায়ী যতটা না আন্দোলনের পরিচালনা, তার চেয়ে বেশী ঐতিহাসিকদের সঠিক ধারণার অভাব। *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন শুধুমাত্র বিভিন্ন সংগ্রামের সমষ্টি বা বিভিন্ন বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতির মিশ্রণ ছিলনা। বরঞ্চ রাষ্ট্রক্ষমতায় মূলগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সমরকৌশলের উপর এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও এই সমরকৌশল খুব বেশিমাত্রায় তাত্ত্বিক ছিলনা।* আর এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সংগ্রাম, পর্যায়, সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপ, গঠনমূলক কাজকর্ম, মৌলিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সংগ্রামের প্রকরণ, অহিংসা ইত্যাদি। আমরা মনে করি যে এই সমরকৌশল ও এর মূল উপাদানগুলিকে বের করে এনে বিশ্লেষণ করা, তথা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও প্রাপ্তির নিরিখে এর শক্তি ও সীমাবদ্ধতাকে যাচাই করাই ঐতিহাসিকের কাজ।

যদিও আন্দোলনের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী পর্যায়ে এই সমরকৌশলের মূল উপাদানগুলি গড়ে উঠেছিল, তবুও এটি কাঠামোবন্ধভাবে সংগঠিত ও কার্যকরী হয়েছিল আন্দোলনের গান্ধীবাদী পর্বে এবং গান্ধীর রাজনীতির মধ্যে দিয়ে। এইজন্য আমাদের সমরকৌশল-সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা মূলত এই পর্বের উপরেই মনোনিবেশ করব। এবং গান্ধী যে নামে নিজেকে প্রায়শই বর্ণনা করেছেন, সেই 'সর্বাধিনায়ক' হিসাবে আন্দোলনে তাঁর অগ্রবর্তী স্থানের জন্য সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে হবে তাঁর উপর। বন্ধু, শত্রু নির্বিশেষে সবাই তাঁর জীবনদর্শনের উপরেই মনঃসংযোগ করেছে। কিন্তু তাঁর জীবনদর্শনের প্রভাব ছিল সীমাবন্ধ—মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের মধ্যে ছিল তার বিস্তার। আসলে তাঁকে বুঝতে হবে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে যাঁর রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী ও সমরকৌশল এবং সংগ্রামের পদ্ধতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং যা ছিল ভারতীয় ইতিহাসে, সম্ভবত বিশ্ব-ইতিহাসেও, তাঁর মূল অবদান। একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন চিন্তাবিদ্ এবং অক্লান্ত লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দুই প্রধান সমসাময়িক লেনিন এবং মাও-য়ের মত বিস্তারিত তত্ত্ব আলোচনায় যাননি। সেজন্য, যদিও কখনও কখনও তাঁর ভাষণ ও লেখা আমাদের পথ দেখিয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁর কার্যপ্রণালী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের সমরকৌশল আহরণ করা উচিত প্রকৃত আন্দোলন থেকেই, তাঁর রচনা থেকে নয়। একই কারণে আমাদের আলোচনাও সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের উপলব্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই উপলব্ধি সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নতম স্তরের গ্রাম ও তালুক পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মী, এবং সেই সময় যাঁরা জেলা ও প্রদেশের নেতা হিসাবে কাজ করছিলেন, তাঁদের সাক্ষাৎকার থেকে।

আরও দুটি সাধারণ মন্তব্য। জাতীয়তাবাদী সমরকৌশলের অন্যতম ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রের যুক্তি, যার বিরুদ্ধে তা পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়াও ছিল গণ-আন্দোলন হিসাবে এর নিজস্ব যুক্তি। আবার এই সমরকৌশল ছিল একটি জাতির বিশিষ্ট ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের ফলশ্রুতিও। আন্দোলনের বহমানতাকে অবিরাম আত্তীকৃত করে এটি বেড়ে উঠেছিল[১], এবং প্রতিপক্ষের কার্যপ্রণালী ও সমরকৌশলের পরিবর্তনের জবাবে নিজেকে সর্বদা বিকাশোপযোগী ও উন্মুক্ত করে রেখেছিল।[২]

আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, গান্ধীর সমসাময়িক বা পরবর্তী বামপন্থী সমালোচকেরা না এই সমরকৌশলকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, না কোনও বিকল্প সমরকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে একে চিন্তাশীল সমালোচনার মধ্যে ফেলেছেন। গান্ধীর নেতৃত্ব, যে কোনও সুনির্দিষ্ট সময়কালের প্রেক্ষিতে

তার কার্যপ্রণালী, অথবা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুতে তার অবস্থানের কার্যকরী সমালোচনা তখনই সম্ভব হত, যখন সেই সমালোচনা গান্ধীর সমরকৌশলের সঠিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হত। একমাত্র তাহলেই এর শক্তি ও দুর্বলতার স্থানগুলিকে বোঝা যেত, এবং এর ঐতিহাসিক কার্যকারিতাকে সুনিশ্চিতভাবে চ্যালেঞ্জ বা গ্রহণ করা যেত। নয়া-ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরাও জাতীয় আন্দোলনের কোনও সমরকৌশলগত প্রেক্ষিতের অস্তিত্ব স্বীকার করেননা। এর সরল কারণ হল এই যে, এঁদের ইতিহাসচর্চার ছকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন একটি গণ-আন্দোলন অথবা উপনিবেশবাদ-বিরোধী যুদ্ধ হিসাবে স্থান পায়না। এছাড়াও, যেহেতু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রারম্ভিক রাজনৈতিক তাগিদ সবসময় ব্রিটিশদের কাছ থেকেই এসেছিল, এবং প্রতিটি পর্বেই জাতীয়তাবাদীরা এতে সাড়া দেওয়া ছাড়া কিছুই করেননি, তাই জাতীয় আন্দোলনের একটি নিজস্ব সমরকৌশলের পরিকল্পনা থাকাটা তাঁদের কাছে অকল্পনীয় মনে হয়।

দুই

জাতীয়তাবাদী সমরকৌশলের ভিত গড়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও তার রাজনীতি সম্পর্কে এক বিশেষ বোধ। প্রথমত—যেটা আমরা আগেই দেখিয়েছি—উপনিবেশবাদের শোষণমূলক ও প্রভুত্বব্যঞ্জক দিকটি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা হয়েছিল। একইসঙ্গে এও বোঝা গিয়েছিল যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র আধা-প্রভুত্বকামী (hegemonic), আধা-নেতৃত্বমূলক (authoritarian)। এটি হিটলারের জার্মানী, জারশাসিত রাশিয়া, চিয়াং-কাই-শেকের চীন, বাতিস্তার কিউবা, সামোজার নিকারাগুয়া, পোর্তুগিজ মোজাম্বিক, এমনকি ফরাসী শাসনাধীন আলজেরিয়া বা ভিয়েতনাম—এর কোনটির মতই ছিলনা। এর চরিত্রকে আইনানুগ প্রভুত্ববাদ বলে সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল একাধারে প্রভুত্বব্যঞ্জক এবং দমনমূলক, বেসামরিক এবং আধা-ফ্যাসিবাদী।

শক্তির দ্বারাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শক্তিই ছিল এর শেষ অবলম্বন—দস্তানার ভিতর বর্মাবৃত মুষ্টিবদ্ধ হাতের মত এই শক্তিকে প্রায়শই ব্যবহার করা হত। শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের মুখোমুখি হলে রাষ্ট্র নগ্ন শক্তিপ্রয়োগ এবং দমনের (সময়বিশেষে যা হত পাশবিক) আশ্রয় নিত। তার হিংস্র লাঠিচার্জের চিহ্ন বহন করত লক্ষ লক্ষ মানুষ। সহস্র সহস্র মানুষ জেলে কখনও কখনও নৃশংস আচরণের শিকার

হত—যেমন, জেলের নিয়ম ভাঙলেই তাদের নগ্ন পিঠ বা নিতম্বে চামড়ার চাবুক দিয়ে সকলের সামনেই প্রহার করা হত।

কিন্তু এই রাষ্ট্র শুধুমাত্র শক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলনা, ছিল কিছু কিছু পৌর প্রতিষ্ঠান, আইনের অনুশাসন, তথা কিয়ৎপরিমাণে পৌর স্বাধীনতার সৃষ্টি, এবং বিরোধীদের প্রতি কিঞ্চিৎ সহনশীলতা ও শিষ্টাচারের উপরেও। এমনকি দমনের সময়েও এটি কয়েকটি আইনের অনুশাসন এবং প্রশাসনিক নিয়মাবলী মেনে চলত।[৩] অর্থাৎ, এটি ছিল আধা-গণতান্ত্রিক।

উপরন্তু, জনসাধারণের অনুমোদনলাভের জন্য এটি যে দুটি আদর্শের উপর খুব বেশিমাত্রায় নির্ভর করত সেগুলি ছিল : ১. শাসকেরা প্রজা-হিতৈষী এবং ন্যায়পরায়ণ; ২. তাঁদের শাসন স্থায়ী এবং অনতিক্রম্য। প্রজাহিতৈষণার ধারণাটি প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন আদর্শের মাধ্যমে—যেমন, ব্রিটিশরা জনগণের মা-বাপ, তারা ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করছে, বহু শতাব্দীর নৈরাজ্য, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচারী বিচারব্যবস্থা ও কর-নীতির পর আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একটি সুদৃঢ় তথা নিরপেক্ষ প্রশাসন গঠন করেছে, নৈরাজ্য এবং বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা করেছে, যুধ্যমান ভারতীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে দুর্বলদের রক্ষা করেছে এবং ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করেছে, ধনী-দরিদ্র ও উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে আইনের চোখে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, লুণ্ঠনকারী জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের, লোভী পুঁজিপতিদের হাত থেকে শ্রমিকদের এবং অত্যাচারী পুরুষদের হাত থেকে নারীদের রক্ষা করেছে, এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে উন্নত এবং তার জনসাধারণের দারিদ্র্যকে দূর করেছে। ঔপ-নিবেশিক রাষ্ট্র এই মতও ব্যাপকভাবে প্রচার করে যে সে অজেয় এবং তার প্রদত্ত পরিসর এবং উপায়গুলিকে ব্যবহার না করে তার বিরুদ্ধাচরণ বা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এও বলা হয়েছিল যে সে আপনা থেকেই ক্রমান্বয়ে এই পরিসরকে বিস্তৃত করবে এবং এই উদ্দেশ্যে আরও আরও উপায় সরবরাহ করবে।

এছাড়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির কয়েকটি সাধারণ প্রভুত্বব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন, বিরোধীদের দলে টানার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পথ, প্রতিষ্ঠান ও সুযোগসুবিধা সৃষ্টির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা, গণ-আন্দোলন-গুলিকে সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অনুগ্রহপ্রদান, বিক্ষুব্ধদের জন্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, ইত্যাদি। এছাড়াও, কোনও কোনও পরি-স্থিতিতে যখন প্রভুত্বের হ্রাসপ্রাপ্তির দরুণ নগ্ন শক্তিপ্রয়োগ এবং অবদমন

অসম্ভব হয়ে পড়ত বা প্রতিকূল পরিণাম ডেকে আনত, তখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আর কেবলমাত্র এই ধরণের শক্তিপ্রয়োগের উপর নির্ভর করতনা। জাতীয়তাবাদী সমরকৌশল সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এগুলি এবং এধরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে।

এই পর্যায়ে আরও কয়েকটি মন্তব্য করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যে একটি প্রভুত্বব্যঞ্জক চরিত্র অর্জন করেছিল তার একটি কারণ ছিল এই, যে স্বদেশে ব্রিটিশদের একটি গণতান্ত্রিক সরকার ছিল যাকে তার ভারতস্থিত প্রতিনিধিদের নীতি ও আচরণের জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে হত। যখন একটি শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের অভ্যুদয়, দমননীতির উপর নির্ভরশীলতাকে আরও প্রয়োজনীয় করে তুলছিল, ঠিক সেই সময়ে উনিশ শতকের উদারপন্থী-র‍্যাডিক্যাল ধারা, সেইসঙ্গে বিশ শতকে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে এবং লেবার পার্টির ভিতরে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারার আবির্ভাব প্রভুত্বব্যঞ্জক শাসনযন্ত্র এবং মতাদর্শের উপর নির্ভরতাকে অবশ্যকর্তব্য করে তোলে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতিকে আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের সংবেদন-শীলতাকেও বুঝতে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়েছিল। কারণ এই আমলারা শিক্ষালাভ করেছিলেন পাবলিক স্কুলে—যেখানে শেখান হত যে পরাজিত, অসহায় ও প্রতিরোধহীন মানুষকে আঘাত করা উচিত নয়—এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে—যেখানে উদার ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হত; এবং সাধারণভাবে এঁরা ছিলেন একটি সভ্য এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্তান।

নগ্ন শক্তিকেন্দ্রিক শাসনকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এই কারণেও, যে ব্রিটেনের আয়তন এবং ভারতবর্ষ থেকে তার দূরত্ব, তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্মচারী এবং ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যাল্পতার দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষের মত আয়তন ও জনসংখ্যাবিশিষ্ট একটি দেশের পক্ষে এই ধরণের শাসন খুব উপযোগী ছিলনা।[৪] এছাড়াও, ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল একটি শক্তিশালী ও সুকঠিন রাষ্ট্র। এর অধীনে ছিল যথেষ্ট শক্তি। বলতে কি, শেষের দিক ছাড়া সমস্ত সময়েই প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যকরীভাবে শক্তিপ্রয়োগ করার ক্ষমতা এর ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের আধা-প্রভুত্বব্যঞ্জক ও 'বেসামরিক' চরিত্র এবং নগ্ন শক্তি-নির্ভর শাসনের সঙ্গে এর পার্থক্যকে জাতীয়তাবাদীরা সম্যক্ অনুধাবন করেছিলেন। আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের বেশিরভাগই—এমনকি যাঁরা নৃশংস লাঠিচার্জের শিকার হয়েছিলেন বা দীর্ঘবছর জেলে কাটিয়েছেন, তাঁরাও—এই দিকটির প্রতি নির্দেশ করেছেন। বেশ কিছু

মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী—বিশেষত অন্ধ্র এবং গুজরাটে, যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের যোগদান ছিল ব্যাপক—আমাদের বলেছেন যে তাঁরা জেলে যেতে পেরেছিলেন, অথবা তাঁদের পরিবারবর্গ তাঁদের জেলে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন এইজন্যই, যেহেতু তাঁরা জানতেন অথবা আঁচ করেছিলেন যে পুলিশ-তাঁদের সঙ্গে অসদাচরণ করবেনা। অনেক সাক্ষাৎকারদাতা বলেছেন যে হিটলার বা জারের বিরুদ্ধে একটি অহিংস সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হতনা। এমনকি গোয়াতে পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধেও যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং অবশেষে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, সেকথাও কয়েকজন উল্লেখ করেছেন। সাক্ষাৎকারদাতা বহু জাতীয়তাবাদী এবং প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী ১৯৪৭-এর শান্তিপূর্ণ ক্ষমতাহস্তান্তরের পিছনে যে যুক্তি দেখেছেন তা হল এই: ব্রিটিশরা বুঝেছিল যে পুরনো ধরণের শাসন তারা আর চালাতে পারবে না; মুখ্যত শক্তি এবং বর্বর শাসনপ্রকরণের উপর নির্ভরতার মাধ্যমে তাদের প্রশাসনের ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে নিজেদের অবস্থানকে দীর্ঘায়িত করতে তারা ইচ্ছুক ছিল না।[৫]

ব্রিটিশ শাসনের এই আধা-প্রভুত্বব্যঞ্জক, আধা-দমনমূলক চরিত্র সম্পর্কে গান্ধীও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর **হরিজন** পত্রিকায় তিনি লেখেন: "সব মিলিয়ে ভায়তবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব একটি অভিশাপ। যেমন ব্রিটিশ অস্ত্রশক্তি, তেমনই আইনসভা, খেতাব-বণ্টন, বিচারালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক নীতি ইত্যাদিও এই প্রভুত্বকে রক্ষা করেছে।"[৬] ২৩ এপ্রিল ১৯৩৮-এর **হরিজনে** তিনি লেখেন: "কংগ্রেসের পিছনে আছে কেবলমাত্র নৈতিক শক্তি। শাসকশক্তির আছে সামরিক ক্ষমতা, যদিও প্রায়শই সে নৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে সামরিক ক্ষমতাকে তরল [অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রশমিত] করে।"[৭] ঐ মাসেই উড়িষ্যার রাজনৈতিক সংকটের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি "স্বৈরাচারের আত্মাভিমানের" উল্লেখ করেন, যা "নির্ভর করে শাসিতের কাছ থেকে বলপূর্বক আদায়ীকৃত বশ্যতার উপর, সে ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক যাই হোকনা কেন।"[৮] সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের সংকটপ্রসঙ্গে ৬ অগস্টের **হরিজনে** তিনি লেখেন: "গণতন্ত্রী ব্রিটেন ভারতবর্ষে এমন একটি সুকৌশলী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যার দিকে তাকালে, আমরা দেখতে পাই যে এটি একটি সুসংগঠিত এবং দক্ষ সামরিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৯] ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র এবং বিশুদ্ধ কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্পর্কে গান্ধীর বোধ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ১৯৩৮-৩৯-এ দেশীয় নৃপতিশাসিত রাজ্যগুলি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে—বিশেষত যখন তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন কেন কংগ্রেস ঐ অঞ্চলে

প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং কেন কংগ্রেসী-ধরণের আন্দোলন ও প্রচার সেখানে শুরু করতে গেলে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, ত্যাগ ও জনসমর্থনের প্রচুর সংস্থান প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৮-এ দেশীয় রাজ্যগুলির বিষয়ে হরিপুরা প্রস্তাবনার প্রসঙ্গে তিনি একদল রাজনৈতিক কর্মীকে বোঝান যে কেন কংগ্রেসের পক্ষে তার নিজের পতাকার সম্মানরক্ষা ব্রিটিশ ভারতে সম্ভব হলেও দেশীয় রাজ্যগুলিতে নয়: "ব্রিটিশ ভারতে আমরা যে কোনও সৎ-উদ্দেশ্যে আইন অমান্য অবলম্বন করতে পারি, কিন্তু রাজ্যগুলিতে তা অসম্ভব। কংগ্রেস কমিটিগুলি সর্বদাই রাজ্যগুলির অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, সুতরাং তাদের অবস্থা আফগানিস্তানের সেই কমিটির তুলনায় কখনোই ভালো হবেনা, যার অস্তিত্ব আফগানিস্তানের সরকারের দাক্ষিণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।"[১০] ১৯৪২-এ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গান্ধী যেমন একদিকে "ব্রিটিশ শাসনের শক্তিশালী ফ্যাসিবাদী উপাদানের" উল্লেখ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে "ফ্যাসিবাদ ও যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করছি, তাদের মৌলিক পার্থক্যেরও"[১১] উল্লেখ করেছেন।

এই আধা-প্রভুত্বব্যঞ্জক, আধা-কর্তৃত্ববাদী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এর বিরুদ্ধেই জাতীয় আন্দোলন ধীরে ধীরে তার কার্যপ্রণালী ও সমরকৌশল গড়ে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কার্যপ্রণালী ও সমরকৌশল আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্রের উপর যতটা না নির্ভর করত, তার চেয়ে বেশি করত যে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে তার রাজনৈতিক কাঠামো বা চরিত্রের উপর। উদাহরণস্বরূপ, তেইপিং কৃষকেরা, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমর-প্রভুরা, বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী সান ইয়াৎ-সেন, কমপ্রাডোর বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভূস্বামীদের নেতা চিয়াং কাই-শেক, এবং শ্রমিক ও কৃষকদের নেতা কম্যুনিস্টরা—প্রত্যেকেই চীনে সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল, যদিও আন্দোলনগুলির শ্রেণীচরিত্রে পার্থক্য ছিল প্রচুর। উনিশ শতকে পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি এবং বস্তুত গোটা লাতিন আমেরিকার এবং বিশ শতকে তুরস্ক ইত্যাদি দেশের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

তিন

(i) অবস্থানের লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল 'অনেক বেশি জটিল রাজনৈতিক সংগ্রাম'। এটি ছিল সংগ্রামের বিভিন্ন ধরণের (forms) একটি সুনির্দিষ্ট সমাহার যাতে রাজনৈতিক উপাদান সর্বদাই সামরিক উপাদানকে ছাপিয়ে যেত। এই অবস্থানের লড়াইয়ের একটি আদর্শ উদাহরণ

ছিল ভারতে গান্ধীর প্রতি-ঔপনিবেশিক প্রতিরোধ—পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি হিসাবে বয়কট আন্দোলন। এক্ষেত্রে দেখা যায় 'মিশ্রিত সংগ্রামের পদ্ধতি—যা চরিত্রে ছিল মূলত সামরিক, কিন্তু যার রণভূমি প্রধানত গড়ে দিয়েছিল রাজনীতি।' গ্রামসচির নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে একটি ভিন্ন ঐতিহাসিক উদাহরণ নিলে আমরা জেনারেল গিয়াপের অনুসরণে অবস্থানের লড়াইয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি এইভাবে: 'দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধের একটি সমরকৌশল,' একটি জনযুদ্ধ যেখানে 'বৃহৎ সাফল্য নিহিত থাকে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বিজয়ের একত্রকরণের মধ্যে।'

ভিয়েতনামের লড়াই যতই আলাদা হোক না কেন, গ্রামসচির চিন্তনের সারবস্তুর কাছে তা খুব বেশি অচেনা ছিলনা। গান্ধীবাদী প্রতিরোধের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গ্রামসচি জোর দিয়ে বলেছেন যে 'যে দেশ প্রযুক্তিগতভাবে নিরস্ত্র এবং সামরিক দিক থেকে নিকৃষ্ট, এবং যেখানে প্রযুক্তিগতভাবে বিকশিত ও উন্নত দেশগুলি প্রভুত্ব করে, সেই দেশের পক্ষেই এই ধরণের সংগ্রাম উপযুক্ত।' গোড়াতেই 'অল্পসংখ্যক শোষণকারী বৃহৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের বস্তুগত শক্তিহীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়।' এই ধরণের পরিস্থিতি থেকেই জন্ম নেয় 'অবস্থানের লড়াই।' এই অসম পরিস্থিতি—যেখানে শত্রু বেশি শক্তিশালী—থেকে শুরু হয় এক 'দীর্ঘমেয়াদী' সংগ্রাম। সে পর্যায়ক্রমে (রক্ষণাত্মক পর্ব, আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা, প্রতি আক্রমণ) এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে।

একান্ত প্রয়োজনীয় যে শক্তি সমাহার—যা 'প্রভুত্বের অভূতপূর্ব কেন্দ্রায়ন' নামে বিখ্যাত—তা শুধু শত্রুপক্ষের পরিখার উপর আক্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এরজন্য প্রয়োজন হয় 'এক বৃহৎ জনসাধারণের; একটি গণসংগ্রামের।' এইজন্যই 'প্রতিটি দেশের স্বতন্ত্র ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ' ব্যতিরেকে [এই লড়াই] অসম্ভব।

এর জন্য রণক্ষেত্রকে সম্যক্ পর্যবেক্ষণ করার এবং সম্ভাব্য পরিখা ও দুর্গগুলিকে—অর্থাৎ শিষ্ট সমাজের উপাদানগুলিকে—সঠিকভাবে চিনে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

এই সূত্রগুলিকে একটি সমরকৌশলের তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করে বলা যায় যে সমাজের মুখ্য ও গৌণ বৈপরীত্যগুলির এক অভূতপূর্ব অবরোধই একটি দীর্ঘমেয়াদী সমরকৌশল হিসাবে অবস্থানের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যায়। গ্রামসচির মতে পশ্চিমের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনসাধারণ ও তাদের সংগঠনগুলির উপর ভিত্তি করে এইটিই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য সমরকৌশল; এইজন্যই এর দ্বৈত শ্রেণীচরিত্র (Christine Buci-Glucksman, *Gramsci & the State*, পৃ. ২৫১-৫২)।

(ii) সুতরাং ভারতের ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিল…তিন ধরণের যুদ্ধ : আন্দোলনমূলক যুদ্ধ, অবস্থানের লড়াই এবং অপ্রকাশ্য বা গোপন যুদ্ধ (underground warfare)। গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ একধরণের অবস্থানের লড়াই যা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আন্দোলন-মূলক যুদ্ধে এবং অন্যান্য মুহূর্তে গোপন যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। বয়কট হল অবস্থানের লড়াইয়ের একটি বিশেষ ধরণ, যেমন ধর্মঘট আন্দোলনমূলক যুদ্ধের এবং সঙ্গোপনে অস্ত্র-নির্মাণ ও যুদ্ধোপযোগী সৈন্যসজ্জা গোপন যুদ্ধের (Antonio Gramsci, *Prison Notebooks*, পৃ. ২২৯-৩০)।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান সমরকৌশলগত লক্ষ্য ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী আধিপত্যকামী (hegemonic) সংগ্রাম শুরু করা। গ্রামসূচির পরিভাষায় এটি ছিল একটি অবস্থানের লড়াই—নরনারীর হৃদয়-মন অধিকারের উদ্দেশ্যে এক সংগ্রাম যা বিভিন্ন খাতের মধ্যে দিয়ে এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন আন্দোলন, পর্ব ও স্তরের মাধ্যমে ক্রমাগত জনসাধারণের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করে। এই সমরকৌশলের দুটি প্রধান ঝোঁক ছিল। এটি ছিল আধিপত্যকামী এবং এটি পর্যায়ক্রমে কখনও বৈধতার সীমাতিগ গণসংগ্রাম, কখনও আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই আপোস বা সাময়িক যুদ্ধবিরতির —অর্থাৎ গ্রামসূচির পরিভাষায় কখনও স্থান পরিবর্তনের যুদ্ধের (war of manoeuvre) এবং কখনও অবস্থানের লড়াইয়ের—চেহারা নিত। কিন্তু দুটি পর্যায়ই জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবকে বিস্তৃত করার দিকে মনোযোগী ছিল। মূল সমরপরিকল্পনা ছিল একই, তবে বিভিন্ন পর্যায়ে ও কালানুসারে কৌশলের রকমফের হত। এছাড়াও, উপ-নিবেশবাদকে ধীরে ধীরে সংস্কার করা বা তার সঙ্গে 'বোঝাপড়ায়' আসা অথবা তার পক্ষে যোগদান করা অথবা তার সঙ্গে শক্তি ও সুবিধার অংশভাগী হওয়া এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিলনা। আধিপত্যধর্মী ক্ষমতার সংরক্ষণের দ্বারা সক্রিয় সংগ্রাম গড়ে তোলার এবং তার সাহায্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা ছিল এটি। যদিও এটি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের এবং অনেকাংশে লেনিনের সমরপরিকল্পনার ছকেরও বিকল্প, তা সত্ত্বেও শেষোক্তের এবং এর সমরপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল একই—অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।

এই সমরপরিকল্পনার কার্যকারিতা ও বৈধতা এবং একে ভিত্তি করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার শক্তি সম্পূর্ণভাবে নিহিত ছিল জনসাধারণের সক্রিয় যোগদানের মধ্যে। সুতরাং তাঁদের রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত করে এবং সক্রিয় করে তুলে রাজনীতির পরিমণ্ডলে নিয়ে আসতে হয়েছিল। জনসাধারণের, বিশেষত গ্রামীণ জনগণের, রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা—যা

ঔপনিবেশিক সরকার সচেতনভাবে রোপণ করেছিল এবং সযত্নে পোষণ করত[১২]—ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার একটি মূল উপাদান। এর পরিবর্তে জনসাধারণকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানোর এবং একত্রকরণের প্রয়োজন ছিল। গান্ধীযুগের আন্দোলনগুলির একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণকে সক্রিয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে নিয়ে আসা। এছাড়া, গণআন্দোলন হিসাবে সত্যাগ্রহের সাফল্য যে শর্তগুলির উপর নির্ভর করত সেগুলি ছিল (ক) জনসাধারণের সক্রিয় অংশ-গ্রহণ (এখানে ক্যাডারদের ভূমিকা প্রধানত জনগণকে সক্রিয়, একত্র ও সংগঠিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল) এবং (খ) উদ্বুদ্ধ জনমতের সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রকাশ।[১৩] গণআন্দোলনের জন্য 'ইস্পাত কাঠামো'-র মত সক্রিয় ক্যাডারদের প্রয়োজন হলেও[১৪] এই আন্দোলন সংজ্ঞানুযায়ী জনসাধারণকেই লড়তে হয়। এই প্রসঙ্গে গান্ধী বারবার জোর দিয়েছেন জনজাগরণের ভূমিকার উপর[১৫], এবং ঘোষণা করেছেন যে জনগণ যখন স্বরাজ "অধিকার করার মত ক্ষমতা অর্জন করে" তখন তারা "স্বরাজ চাইলেই পেতে পারে।"[১৬]

আধিপত্যের লড়াইয়ের একটি প্রধান লক্ষ্য হল জনগণের স্বীয় কর্ম-শীলতাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা ও তাগিদ বৃদ্ধি করা, ঠিক যেমন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল তাদের শক্তিহ্রাস করা। যদি জাতীয় আন্দোলনের সংগ্রামপদ্ধতি অথবা তার জনগণের সংগ্রামের ক্ষমতা ও তাগিদকে ব্যবহার করার ধরণ (mode) ভিন্নতরও হত, তাহলেও এই বৃদ্ধি করার ব্যাপারটি অগ্রগণ্যই থেকে যেত—কারণ এই জিনিসগুলি [অর্থাৎ জনগণের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, ইত্যাদি] নিজেরা বিকশিত হতে পারেনা এবং এদের ছাড়া কোনও ধরণের সংগ্রামই শুরু করা যায় না। দাদাভাই নওরোজী থেকে শুরু করে গান্ধী ও নেহরু পর্যন্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ যে মৌলিক কর্তব্যগুলি পালন করেছিলেন সেগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

বস্তুত, ঐতিহাসিকের দ্বারা সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় আছে এমন প্রধান কাজগুলির অন্যতম হল জাতীয় আন্দোলনে জনগণের উদ্যোজনের (mobilization) জটিল প্রক্রিয়াটির সঠিক প্রকৃতি ও চরিত্র উদ্ঘাটিত করা, এর ধাঁচ এবং বিস্তৃতির মাত্রা নির্ণয় করা, এবং যারা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল তাদের যথার্থ পরিচয় বের করা।

কংগ্রেসী সমরপরিকল্পনার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খুব ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক শাসকদের আধিপত্যে ক্ষয় ধরিয়ে দেওয়া। ব্রিটিশরা শাসন করত শুধুমাত্র শক্তির সাহায্যে নয়, বরং একটি সযত্নরচিত

ও সুসংগঠিত বিশ্বাসতন্ত্র (belife system) ও মতাদর্শের সাহায্যে, যার মাধ্যমে জনগণের মৌন সম্মতি ও নিষ্ক্রিয় স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করা হত। সুতরাং এই বিশ্বাসতন্ত্রের শক্তিহ্রাস করার এবং একে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন ছিল। যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটত এবং জনগণ একটি বিকল্প আধিপত্য-মূলক (counter-hegemonic) বিশ্বাসের জগতে সংগঠিত হত, তখন ঔপনিবেশিক শাসকদের হয় দেশত্যাগ করতে হত অথবা তাদের শাসনের চরিত্র পরিবর্তন করতে হত। অর্থাৎ তাদের বিশুদ্ধ বলপ্রয়োগ বা অবদমনের সাহায্যে—'বেয়নেটের মাধ্যমে'—শাসন করতে হত।

সুতরাং এ লড়াই আদতে ছিল আদর্শের লড়াই। এর উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ সংখ্যক জনগণকে দিয়ে বিকল্প জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও মতাদর্শ-গুলিকে আত্তীকৃত করানো, যাতে তারা বিভিন্নভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে তাদের পরিবর্তিত প্রত্যয় ও বিশ্ববীক্ষাকে প্রকাশ করতে পারত। এই যোগদানের সুযোগ আসতে পারত বিভিন্নভাবে : কারাবরণের সত্যাগ্রহ ও পিকেটিং থেকে আরম্ভ করে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ, জনসভার আয়োজন ও সেখানে উপস্থিতি, 'হরতাল' এবং ধর্মঘট করা থেকে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের জাঠাগুলিকে (jathas), উৎসাহিত করা, নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোটপ্রদান থেকে গান্ধীবাদী গঠনমূলক কর্মোদ্যোগে যোগদান, কংগ্রেসের চারআনা সদস্য হওয়া থেকে শুরু করে খদ্দর ও গান্ধীটুপি পরা, কংগ্রেস তহবিলে সাহায্যদান থেকে কংগ্রেসী বিক্ষোভকারীদের খাওয়ানো ও আশ্রয় দেওয়া, এবং **ইয়ং ইন্ডিয়া**, **হরিজন** ইত্যাদি অবৈধ পত্রিকাগুলি পাঠ ও বণ্টন করা থেকে জাতীয়তাবাদী নাটক ও মুশায়রা দেখা এবং মঞ্চস্থ করা।

আধিপত্যবাদী মতাদর্শের প্রধান লক্ষ্য হল প্রকৃত শত্রুর অবয়ব—অর্থাৎ প্রধান বৈপরীত্যের চরিত্র—গোপন রাখা। আর বিকল্প আধিপত্যবাদী মতাদর্শের লক্ষ্য একে দিনের আলোয় বার করে আনা। যেসব সমাজ মূলত আধিপত্যবাদী নয়, সেগুলিতে শত্রুর অবয়ব স্পষ্ট থাকে অথবা প্রকাশিত হয়ে ওঠে যখনই রাজনৈতিক গণকর্মোদ্যোগ সোৎসাহে গৃহীত হয়। এই ব্যাপারটি ঘটলেই শত্রুর সঙ্গে কিভাবে লড়াই করতে হবে, অর্থাৎ শক্তি বা লড়াইয়ের বস্তুগত উপায়গুলি (resources) প্রধান হয়ে ওঠে। আর আধিপত্যবাদী সমাজে মতাদর্শগত প্রভাব, এবং এর ব্যাপ্তি ও গভীরতাই হল আসল। এইজন্য জাতীয়তাবাদী সমরপরিকল্পনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল এর মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম।

সর্বোপরি, এর অর্থ ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রজাহিতৈষণা ও অজেয়তা, এই দ্বৈতপ্রত্যয়কে দুর্বল করে দেওয়া। প্রথম প্রত্যয়টির শক্তিনাশ এবং

তার জন্য একটি বৌদ্ধিক ছক সৃষ্টি করার কাজটি দাদাভাই নওরোজী এবং অন্যান্য নরমপন্থী নেতারা অত্যন্ত দক্ষভাবে আরম্ভ ও সম্পন্ন করেছিলেন। এই ছকটিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন চরমপন্থীরা, আর জনসাধারণের কাছে গান্ধীযুগে একে পেঁছে দিয়েছিলেন গান্ধীবাদীরা এবং বামপন্থীরা। ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদী প্রকাশনাগুলি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অজেয়তার ধারণাকে সামনাসামনি আক্রমণ করেছিল। এছাড়াও এই আক্রমণ এসেছিল আইন পরিষদগুলিতে ফিরোজশাহ্ মেহ্তা, জি. কে. গোখলে এবং অন্যান্যদের সাহসী নেতৃত্ব থেকে, এবং তিলক, চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকেও। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একে ছড়িয়ে দিয়েছিল মূলত ১৯১৮-র পরবর্তী যুগের আইন-অমান্যকারী গণ-আন্দোলনগুলি। এই আন্দোলনগুলি ছিল মূলত আধিপত্যকামী (এমনকি যখন সেগুলি স্থানপরিবর্তনের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াত, তখনও), কারণ কোনও পরিস্থিতিতেই ক্ষমতা দখল তাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাদের প্রধান লক্ষ্য, ঝোঁক এবং প্রাপ্তি ছিল ব্রিটিশ শাসনের অপ্রতিরোধ্যতার ধারণাটিকে ধ্বংস করা জনগণের মধ্যে নির্ভীকতা, সাহস, যুদ্ধোপযোগী ক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের তাগিদ সৃষ্টি করা, কোনও জাতিকেই যে তার সম্মতি ব্যতিরেকে শাসন করা যায়না, এবং 'স্বৈরাচার', 'শোষণ' ও 'কুশাসন'-কে প্রতিরোধ করা যে জনগণের অধিকারসিদ্ধ ও কর্তব্য, এই সচেতনতা জাগিয়ে তোলা, এবং ব্রিটিশ সরকার ও জনমতকে দেখানো যে ভারতীয় জনসাধারণ জাতীয়তাবাদী আদর্শকে উত্তরোত্তর গ্রহণ করছে।

আন্দোলনের অবৈধ পর্যায়গুলিতেও গান্ধী যে কোনওরকম গোপন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন, তার প্রধান কারণ ছিল নির্ভীকতার সঞ্চার করার লক্ষ্যটি।[১৭] আধিপত্যকামী সংগ্রামে জনগণের সংগ্রামক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা রাখারও প্রয়োজন ছিল। তাছাড়াও, সর্বোপরি এটি ছিল এক নৈতিক যুদ্ধ, নৈতিক শক্তি ও চরিত্রের প্রতিযোগিতা। এইজন্যই নওরোজী থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা সবসময় এক উঁচু নৈতিক আঙিনা থেকেই উপনিবেশবাদ ও ঔপনিবেশিক রাজনীতি নিয়ে তাঁদের যাবতীয় সমালোচনা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ সম্পর্কে সরকারী তদন্তের দাবি করেছিলেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াই নয়, প্রায় সমস্ত বড় আন্দোলনই শুরু হয়েছিল শক্তিশালী নৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে: যেমন ১৯১৯-এর রাওলাট বিল, পাঞ্জাবের অবিচার এবং ১৯২০-২২-এ খিলাফতের প্রশ্নে বিশ্বাসভঙ্গ, লবণকর—যাকে ১৯৩০-এ অর্থনৈতিক অবিচারের চেয়ে নৈতিক অন্যায় হিসাবেই বেশি দেখা হত—১৯৩২-এ জাতীয় নেতৃবর্গ ও

আন্দোলনের উপর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ, ১৯৩৯-এ সম্মতি ছাড়াই ভারতকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করানো, ১৯৪২-এ যে উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল সেগুলি কার্যকর করা এবং ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, এবং ১৯৪৫-এ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদের মুক্তির দাবি। গান্ধীর আমলের অহিংস আন্দোলনগুলি সর্বদাই শাসকদের মিলিত নৈতিক ও সামরিক শক্তির মোকাবিলা করত তাদের নৈতিক কর্তৃত্বের সাহায্যে।[১৮] সবসময়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির কেন্দ্রে ছিল আন্দোলনের নৈতিক বৈধতা এবং সরকারের তুলনায় তার নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন।

কংগ্রেস সমরপরিকল্পনার তৃতীয় লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের সদস্যদের উপরই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি খর্ব করা, তাদের মনোবল ধ্বংস করা, তাদের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব জাগিয়ে তোলা, এবং হয় তাদের নির্বিষ নয়তো তাদের জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে সামিল করা।[১৯] আমলাতন্ত্রের ভারতীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে এই কাজ ততটা কঠিন ছিলনা, কারণ একটি পরাধীন জাতির মানুষ হিসাবে তাঁরা অনিবার্যভাবেই জাতীয়তাবাদী আবেদনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু এমনকি ব্রিটিশ সদস্যদের ক্ষেত্রেও শিষ্ট ব্যবহার এবং জাতিগত বৈরীভাব ও বিদ্বেষ পরিহারের মাধ্যমে এব্যাপারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিল।[২০] ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে গান্ধী **হরিজন** পত্রিকায় লেখেন, "ব্রিটিশ শাসন ছিল সুকঠিন, এমনকি দানবীয়। কিন্তু এই শাসনের পিছনের মানুষজনেরা সেরকম ছিলনা। সুতরাং আমাদের অহিংসার অর্থ ছিল এই, যে আমরা চেয়েছিলাম এই প্রথার শাসকদের রূপান্তর, তাদের বিনাশ নয়..."[২১] জাতীয় আন্দোলন এই কাজে যথেষ্টই সফল হয়েছিল। অংশত এর আধিপত্যবাদী রাজনীতির ফলে, অংশত ১৯৩৭-এ প্রশাসনে কংগ্রেসের অনুপ্রবেশের ফলে, এবং যুদ্ধের পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকার দরুণ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে পুলিশ এবং রেলকর্মচারীদের ব্যবহারে এক গুণগত পরিবর্তন আসে।[২২] সমস্ত ধরনের বহু রাজকর্মচারী অনেক ঝুঁকি নিয়েও ১৯৪২-এর আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন।[২৩] এছাড়াও, ১৯৪৫-এর পর পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে বিশ্বস্ততার যে অন্তর্ধানের কথা সকলেরই জানা, সেটিও সুনিশ্চিতভাবেই ব্রিটিশদের ভারতত্যাগের সিদ্ধান্তের এক প্রধান কারণ ছিল।[২৪] বস্তুত ১৯২০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন ও সত্যাগ্রহীদের প্রতি পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মনোভাবের একটি ঊর্ধ্বগামী রেখা (linear upward moving curve) অঙ্কন করা যায়।

গোড়ার থেকেই জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশ জনসাধারণ ও জনমতের উপর ঔপনিবেশিক মতাদর্শের আধিপত্যকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল। এর সঙ্গে ভারতের অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ও জনমতের সমর্থন লাভ করার চেষ্টাও এই সমরপরিকল্পনার একটি চতুর্থ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। এই লক্ষ্যটি ছিল আধা-গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রের ক্রমাগত সম্প্রসারণ করা এবং বর্তমান ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা থেকে ঔপনিবেশিক সরকারকে নিবৃত্ত করা, যাতে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে আইনমোতাবেক কার্যকলাপ এবং শান্তিপূর্ণ গণসংগ্রাম সংগঠিত করা যেতে পারে।

চার

পর্যায়ক্রমে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির পর্বের উপর ভিত্তি করে যে অধিপত্যবাদী সংগ্রাম দাঁড়িয়েছিল, তার দীর্ঘমেয়াদী চরিত্রই ছিল জাতীয়তাবাদী সমর-কৌশলের দ্বিতীয় প্রধান দিক। গান্ধীবাদী পরিকল্পনা, যার শিকড় নিহিত ছিল নরমপন্থী ও চরমপন্থী পর্যায়ের মধ্যে, তাকে সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম (S-T-S') বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।[১৫] এই পরিকল্পনায় জোরদার বৈধতা-অতিরিক্ত (extra-legal) গণ-আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে সম্মুখসমরের পর্বগুলির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আসত সেইসব পর্ব যেখানে এড়িয়ে যাওয়া হত সামনাসামনি লড়াই, ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে আদায় করা সুযোগসুবিধা সংস্কারগুলিকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রূপায়িত করে তাদের সীমাবদ্ধতা বা অপ্রতুলতাকে লোক-সমক্ষে তুলে ধরা হত, এবং আইন ও সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই জনসাধারণের মধ্যে চালানো হত বিপুল রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কর্মযজ্ঞ। আইন ও সংবিধানের কাঠামোয় এধরনের কাজের সুযোগও মিলত। ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করা হয়েছিল আরও ব্যাপক আরেকটি গণ-আন্দোলনের জন্য, এবং অবশেষে 'ভারত ছাড়ো'-র দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল জনগণ, ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল চূড়ান্ত ছাড়, অর্থাৎ স্বাধীনতা। উপনিবেশবাদের আধিপত্য হ্রাস করা, কর্মী সংগ্রহ করা ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, এবং জনসাধারণের সংগ্রাম ক্ষমতা গড়ে তোলার কাজে আন্দোলনের দুটি পর্যায়কেই তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। উপরে যাকে সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম বা S-T-S' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটি ছিল ঊর্ধ্বাভিমুখী এবং প্যাঁচালো। এতে অনুমান করা হয়েছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরপর কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করবে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটবে ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বারা ক্ষমতা-হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে। মাধবলাল শংকরলাল পান্ড্য নামে একজন পুরনো

স্বাধীনতা সংগ্রামী—গুজরাটের খেড়া জেলার বোরসাদের এক গ্রাম ও তালুক পর্যায়ের নেতা—এই পরিকল্পনাকে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব বর্ণাঢ্য ভাষায় : লড়ো (লড়াই কর)—যো মিলে সো লো (যা পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে নাও) (তিনি বলেছিলেন যে এ হচ্ছে আমাদের লড়াই করে পাওয়া)—ভোগো (একে ব্যবহার কর) (কিন্তু জনগণের জন্য, নিজের জন্য নয়, বলেছেন তিনি)—ফির লড়ো (আবার লড়াই কর)।[২৬]

এই পরিকল্পনায় মনে করা হয়েছিল যে অগ্রগতি আসবে পর্যায়ক্রমে ; কিন্তু এই পর্যায়গুলি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়, স্বাধীনতার নয়। স্বাধীনতা ছিল একটা গোটা ব্যাপার ; যতক্ষণ না একে পুরোপুরি জয় করা গিয়েছিল, ততক্ষণ এর কোনও মানেই ছিল না। "ধীরে ধীরে" বা "দু'আনা-চারআনার মত খুচরো পদ্ধতিতে" একে জয় করা যায়না বলে নেহরু মতপ্রকাশ করেছিলেন।[২৭] ১৮৯২, ১৯০৭, ১৯১৯, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সাংবিধানিক ছাড়গুলিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল হিসাবেই নেওয়া হয়েছিল, স্বাধীনতার অর্ধাংশ বা এক-চতুর্থাংশ বলে মনে করা হয়নি। প্রতিটি পর্যায়েই আগের তুলনায় এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল আরও এক ধাপ, কিন্তু সেজন্য এই ধারণাগুলি মিথ্যা যায়না যে জাতির মুক্তির কাজ তখনও ছিল অসম্পূর্ণ, রাষ্ট্রশক্তি প্রকৃতপক্ষে তখনও ছিল শত্রুপক্ষ, এবং ক্ষমতাহস্তান্তরের চূড়ান্ত ঘটনাটি না ঘটা অবধি এই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। তাই সংস্কারগুলিকে ব্যবহার করার মানেই ছিল প্রথার (System) সঙ্গে হাত মেলানো, এটা মনে করা ভুল ; আন্দোলন কখনোই প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়নি।[২৮] বস্তুত পরিকল্পনার একটি প্রধান অংশ ছিল বিরোধীর বা শত্রুর দ্বারা প্রলুব্ধ না হয়ে পর্যায় থেকে পর্যায়ান্তরে উত্তীর্ণ হওয়া। যে পর্যায়গুলি গণ-আন্দোলনের উপর নির্ভরশীল ছিল না, সেগুলিও বস্তুত অরাজনৈতিক বা সংগ্রামহীন পর্যায় ছিলনা। এই পর্যায়গুলিতে আইন অমান্য ও আইনভঙ্গ থেকে গণ-বিক্ষোভ এবং বিপুল মতাদর্শগত কর্মোদ্যোগের দিকে সংগ্রামপদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছিল মাত্র ; এর মধ্যে ছিল নেতাদের ব্যাপক সফর, বিশাল বিশাল জনসভার আয়োজন ইত্যাদি।

এছাড়া গণআন্দোলনহীন পর্যায়টি প্রধান পর্যায়ও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র যুদ্ধের প্রধান নিয়ন্তা হিসাবে যাকে দেখা হয়েছিল, সেই গণআন্দোলনের এটি ছিল কেবল প্রস্তুতিক্ষেত্র। নেতৃবর্গ সর্বদাই দুটি পৃথক গণ-সংগ্রামের মধ্যেকার সময়ব্যবধানটিকে কমাতে আগ্রহী ছিলেন।[২৯] কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও মনোগত (Subjective) সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিলনা। এর জন্য জনসাধারণের সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রস্তুতির

উপর নির্ভর করতে হত। উপরন্তু, দু'ধরণের পর্যায়কেই দেখতে হবে একই আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পর্যায় হিসাবে। এরা ছিল একই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমরপরিকল্পনার অংশ, এবং এদের মধ্যে প্রতি-সাম্রাজ্যবাদী উপাদান ছিল একইরকম জোরদার। এদের মধ্যে কোনরকম অসঙ্গতি ছিল না; একটির মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস (যদিও তার সামনে আত্মসমর্পণ নয়), আরেকটির কেন্দ্রে ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। রাজনৈতিক সংগ্রাম ছিল চিরস্থায়ী, পরিবর্তন ঘটেছিল শুধু তার আকৃতির। গান্ধীর ভাষায় বলতে গেলে, "আইন অমান্যের বিরতির অর্থ সংগ্রামের বিরতি নয়। সংগ্রাম শেষ হবে তখনই যখন ভারতবর্ষ তার নিজের প্রণীত সংবিধানের অধিকারী হবে।"[৩০] এর কিছুদিন পরে তিনি বলেছিলেন: "সত্যাগ্রহে নৈরাশ্য বা মনস্তাপ বলে কিছু নেই। লক্ষ্যে না পৌঁছনো অবধি সংগ্রাম কোনও না কোনও আকারে সর্বদা চলতেই থাকে। যে সংগ্রামে একজন সত্যাগ্রহীকে আহ্বান করা হয়েছে তা আইন অমান্য না অন্য কোন পর্যায়, তাতে তার কিছু এসে যায় না। আইন অমান্যের অগ্রগতির মাঝপথে তাকে থামতে এবং অন্য কিছু করতে বলা হলেও সে কিছু মনে করে না।"[৩১]

সমসাময়িক অনেক কংগ্রেস নেতাই সমরপরিকল্পনার সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রামের (S-T-S') দিকটিকে এবং 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' পর্যায়ের সম্পর্ককে ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। যেমন, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালিনী ১৯৩৫-এ বিশাখাপত্তনমে এক শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেন:[৩২]

> আমরা চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি যে ছেলেভোলানো আইন-পরিষদের মাধ্যমে সাংবিধানিক কাজকর্ম থেকে বিশেষ কিছুই লাভ হয়নি। প্রার্থনা, প্রতিবাদ বা আর্জির সাহায্যে আমরা সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু সবসময় যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিহাস পাঠ করে আমরা জানি যে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামেই তুলনামূলকভাবে শান্তির সময়ও এসেছে—যে সময়ে তারা তাদের প্রাপ্তিগুলিকে সংহত করেছে এবং নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছে। সেইভাবেই, এখানেও দেশের পক্ষে সর্বক্ষণ যথেষ্ট শক্তিক্ষয় ও আত্মত্যাগ স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপর উপর দেখলে মনে হতে পারে যে আমরা লড়াই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু জাতির অভীষ্টসিদ্ধির মুহূর্ত অবধি জাতীয় সংগ্রাম পরিত্যাগ করা যায় না। জাতির উদ্যমের আরেক উত্থানের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। জাতি হল সমুদ্রের মত; তারও জোয়ার-ভাঁটা আছে। আমরা

কৃত্রিম উপায়ে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারি না, ভাঁটার সময়ও এগিয়ে যেতে পারি না। ১৯২১-এ আমরা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করি, এবং আরেকটি প্রচেষ্টার জন্য আমাদের ১৯৩০ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আমরা শক্তিসঞ্চয় করছি এবং জাতীয় উদ্যমের আরেকটি অন্তঃপ্রবাহের অপেক্ষায় আছি।

কংগ্রেসের লক্ষ্নৌ অধিবেশনে তিনি বলেন :[৩৩]

এই ব্যাপারটি ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা মন্দার কবলে রয়েছি। এর মানে এই নয় যে কোনও কাজ করার মেজাজ আমাদের এই মুহূর্তে নেই বলে ছোটখাটো কাজে আমরা হাত দেব না। আমরা ঠিক ব্যারাকের মধ্যে একটি সৈন্যদলেরই মত। এই ধরণের সৈন্যবাহিনীর কাজ কি? এদের সমস্ত কাজকর্ম আপাতদৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ, নিষ্প্রভ এবং সময়ে সময়ে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। সৈন্যরা পরিখা খনন করে, আবার পরদিনই তা বুজিয়ে দেয়, বড় বড় মহড়া করে কিন্তু কোথাও যায় না, হত্যার উদ্দেশ্য ছাড়াই চাঁদমারিতে গুলি ছোঁড়ে।

অনভ্যস্তের চোখে এসব কিছুরই কোনও মূল্য বা মানে নেই। কিন্তু কুচকাওয়াজ করা, মাটি খোঁড়া, মার্চ করা এবং গুলি ছোঁড়া আপাতদৃষ্টিতে যতই অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন, শিক্ষিত সামরিক চোখে এগুলি যুদ্ধের প্রস্তুতির অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এগুলিকে অবহেলা করা হলে কোনও সৈন্যবাহিনীই যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে পারে না। একটি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনেও মন্দা ও নিষ্ক্রিয়তার সময় আসতে পারে। সেই সময়গুলিতে যেসব কর্মসূচী উদ্ভাবিত হয় তাদের চেহারা সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপের মত হলেও আসলে তারা সমস্ত বৈপ্লবিক সমরপরিকল্পনারই অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

আন্দোলনের আরেক নেতা, কে. এম. মুনশী, এর গতিসূত্র সম্পর্কে তাঁর বোধকে প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে।[৩৪]

বিগত তিরিশ বছরের কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে দেখা যায় কিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ছন্দোময় আন্দোলনগুলি থেকে এই শক্তি বিকশিত হয়েছিল। ঝড়ের পর এসেছে শান্তির সময়, তার পর এসেছে আরও বড় ঝড়। পর পর প্রত্যেকটি আন্দোলনেই দেখা গেছে যে এর ভিত হয়েছে আরও প্রশস্ত, প্রতিরোধ হয়েছে দৃঢ়তর। এটা কংগ্রেস পেরেছে অবাস্তব স্লোগানের চিৎকার বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশের মাধ্যমে নয়, শান্তির সময়গুলিতে জনজীবনের উপর ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের মাধ্যমে। অতএব, কংগ্রেসের

প্রকৃত লক্ষ্য হল সমস্ত ধরণের সরকারী ও বেসরকারী সামাজিক সংগঠনের উপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে দেশকে এক নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত করা।

পাঁচ

সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম (S-T-S') সমরপরিকল্পনা নিয়ে একটি মূল প্রশ্ন ছিল : এই আন্দোলনে দু'ধরণের পর্যায় থাকার প্রয়োজন ছিল কেন? কেন অবস্থানের যুদ্ধ অনিবার্যভাবেই অনুসরণ করেছিল আন্দোলনমূলক যুদ্ধকে? সংগ্রাম কেন নিরবচ্ছিন্ন হতে পারেনি? সমরপরিকল্পনার ছক কেন ছিলনা সংগ্রাম-বিজয় (Struggle-Victory / S-V), যেমনটি চেয়েছিলেন ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে নেহরু সহ অন্যান্য বামপন্থীরা?[৩৫] এর উত্তরের জন্য আমরা অনেকখানি নির্ভর করেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ-গ্রহণকারীদের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার উপর, যা আমাদের গৃহীত সাক্ষাৎকার-গুলিতে ধরা পড়েছে। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী-গান্ধীবাদী নির্বিশেষে নিচের সারির গ্রাম ও তালুক পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মীরা—যাঁরা আসলে প্রাথমিক স্তরে গণসত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলিকে সংগঠিত করেছিলেন—এর উত্তর সম্পর্কে বস্তুত একমত।

গান্ধীবাদী পরিকল্পনার কেন্দ্রে ছিল কয়েকটি ধারণা : যেমন, একটি গণআন্দোলনকে তার বিশিষ্ট স্বভাবের জন্যই অনির্দিষ্টকাল ধরে, এমনকি এক দীর্ঘ সময় ধরেও, চালানো বা টিঁকিয়ে রাখা যায় না; আগেই হোক বা পরেই হোক, যে কোনও গণআন্দোলনেই এক সময় ভাঁটার টান আসবেই; কোনও গণআন্দোলনই চিরদিন বৃদ্ধি পেতে পারে না, সুতরাং তাদের স্বল্প-মেয়াদী ভিত্তিতে চালানো দরকার; এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও সংহতির, অর্থাৎ "হাঁফ ছাড়ার", সময় থাকা উচিত, যাতে আন্দোলন সংহত ও পুন-রুজ্জীবিত হতে পারে এবং সংগ্রামের পরবর্তী ধাপের জন্য শক্তিসঞ্চয় করতে পারে।

এসবের কারণ কি ছিল? কারণ আন্দোলনে যোগদানকারী জনতা কিছু সময় পরেই অনিবার্যভাবেই পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। তাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম করার, তার দমনের (কারারুদ্ধকরণ, প্রায়ই পাশবিক লাঠিচার্জ, বিশাল জরিমানা আরোপ, এবং সম্পত্তির নীলাম ও বাজেয়াপ্তকরণ) মোকাবিলা করার ক্ষমতা অপরিসীম ছিল না, যেমন ছিলনা তাদের আত্মত্যাগ এবং কষ্ট (বিশেষত তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার) সহ্য করার ক্ষমতাও। এই ক্ষমতা এখনও সীমাহীন নয়। দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ সম্বন্ধে অবগতি, শোষণ ও দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতনতা, এবং জাতীয়তাবাদের প্রতি আদর্শগত

আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও, ক্ষয়ক্ষতির বিপুল সম্ভাবনা থাকার দরুণ জনসাধারণ একটি সময়ের পর আর যুদ্ধে যোগদান করতে পারত না। এর সমাধান হচ্ছে আদর্শগত অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তাদের ত্যাগস্বীকার ও মূল্যদানের ক্ষমতাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া, এবং একই সাথে এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করা ও তাকে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া।[৩৬] এটাও ভেবে দেখা উচিত যে রাষ্ট্র যখন শক্তিশালী, সে যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়নি, তখন একটি আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেবার মত যথেষ্ট শক্তি তার আছে। ঠিক এই জিনিসটিই করা হয়েছিল ১৯৩২-৩৩-এ উইলিংডনের সময় কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে, এবং ১৯৪২-এ লিনলিথগোর প্রশাসনের 'সিংহসদৃশ হিংস্রতা' প্রয়োগের মাধ্যমে।

ক্ষয়ক্ষতির মূল্য বহন করার ক্ষমতা যে শুধুমাত্র সম্পত্তি-ভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভূম্যাধিকারী কৃষকদের, এমনকি ক্ষুদ্রতম কৃষকদের উপরেও রাষ্ট্র জমি কেড়ে নেবার ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারত। ১৯৩২-এ অল্প কয়েকটি সাহসী অঞ্চল বাদ দিলে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের খুব চটপট দমন করা সম্ভব হয়েছিল, কেননা সরকার জরিমানা উশুল এবং কর আদায় করার জন্য নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি ও সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল। কৃষিশ্রমিক, শহরের দিনমজুর, এবং তাদের পরিবারবর্গ, যারা সম্পূর্ণ নির্ভর করত তাদের দৈনিক রোজগারের উপর, তারা যে শুধু বেশিদিন আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারেনি তাই নয়, এমনকি আন্দোলনের আইন ভাঙা ও জেলে যাওয়ার পর্বটিতে অংশগ্রহণ করাও তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাজার হলেও একজন কৃষকের জমি চাষ করার জন্য তার ভাই অথবা রায়ত (tenant) ছিল; মধ্যবিত্ত, জমিদার আর মাঝারি মাপের কৃষকদের ছিল কিছু আর্থিক সঞ্চয় বা পারিবারিক সহযোগিতা। কিন্তু রুটি-রোজগেরে লোক কিছু সময়ের জন্য কাজ করতে না পারলেও দিনমজুর ও তার পরিবারকে উপোস করতে হত। আমরা বলতে পারি যে জনগণের অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতার এই চিত্র প্রমাণ করেনা যে, যে সমস্ত মধ্যবিত্ত বা 'বুর্জোয়া' নেতাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁরা কাপুরুষ। অন্য অনেকের মধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারাও এই মত পোষণ করেন। যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল, যে ক্যাডারদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাঁরা ১৯৪৭ পর্যন্ত—এবং অনেকসময় তার পরেও—জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যের প্রতিই জীবন সমর্পণ করেছেন। তাঁরা ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের সবসময়ের কর্মী, শুধু দল থেকে তাঁরা কোনও বেতন পাননি। তাঁদের মত হাজার হাজার লোকের সাথে তাঁরাও অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, বীরের মত রাষ্ট্রের অত্যাচার আর বাস্তুভিটে হারানোর ক্লেশ সহ্য করেছিলেন। সারাজীবন ধরে

ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন অবধি বিবাহ করবেন না বলে অনেকেই শপথ নিয়েছিলেন। এঁরা সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন জেলে, বা আশ্রমে, বা খাদি ভবনে, অথবা ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভার কার্যালয়ে বসে থেকে। আবার কেউ কেউ নেহরুর মত কোনদিন বাড়িতে থাকেননি, কিন্তু বছরভর চষে বেড়িয়েছেন সারা দেশ। এঁরা ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের 'স্থায়ী সৈন্যবাহিনী'।[৩৭] কিন্তু গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের মত তাঁরাও বুঝেছিলেন যে একটি গণআন্দোলন শুধু 'স্থায়ী সৈন্যবাহিনী' দিয়ে চালানো যায়না, জনসাধারণকে সংগঠিত ও একত্রিত করার ব্যাপারে তার ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোকনা কেন। বস্তুত, এটা বোঝা গিয়েছিল যে, যে আন্দোলন 'স্থায়ী সেনাদলের' উপর নির্ভরশীল সে তার গণচরিত্র (mass character) দ্রুত হারিয়ে ফেলে।[৩৮]

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে পরিকল্পনা জনগণের উপর নির্ভরশীল তার একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হল রাষ্ট্র ও তার আইনের বিপক্ষে সংঘর্ষহীনতার পর্বে আন্দোলনকে সরিয়ে বা বদলে নেওয়া। এর ব্যতিক্রম শুধু চূড়ান্ত পর্যায়, যখন গ্রামসূচির ভাষায় দুর্গ আক্রান্ত বা অধিকৃত হয়, অথবা—গান্ধী যেমন ভেবেছিলেন—ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। গান্ধী এটা বুঝেছিলেন কারণ তিনি জানতেন ঠিক কোন্ সীমা পর্যন্ত জনগণ এবং সরকার যেতে পারে, এবং সেইমত তাঁর সমর-পরিকল্পনা ও কৌশল ছকে ছিলেন।

গান্ধীবাদী নেতৃত্বের সমালোচকেরা এমন কোনও পরিকল্পনার ছক খুঁজে পাননি যার মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল আন্দোলনের কৌশল। সুতরাং সরে-আসার সিদ্ধান্তের উৎস তাঁরা খুঁজেছেন শ্রেণীগত পক্ষপাত বা চারিত্র শ্রেণীর চাপ, বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করার প্রবণতা স্নায়ুচ্যুতি (loss of nerve), নৈতিক অনুশোচনা ইত্যাদির মধ্যে, সমর-পবিকল্পনার ছকের মধ্য দিয়ে নয়। কিন্তু অবস্থানের লড়াইয়ের সমর-পরিকল্পনাগত প্রেক্ষিতের মধ্যে থেকে দেখলে, প্রত্যাহার বা সরে-আসা হয়ে ওঠে এই পরিকল্পনারই এক অবশ্যম্ভাবী অংশ। সত্যাগ্রহ অবশ্যই শেষ হয় প্রত্যাহার বা আপোসবন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে; কিন্তু তার পরিসমাপ্তির ধরণ ও ক্ষণতার সূত্রপাতের মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে একইরকম রাজনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম (S-T-S') রণপরিকল্পনার প্রেক্ষিতের মধ্যে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি কৌশলগত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এর সঙ্গে কি বাস্তব পরিস্থিতির সাযুজ্য ছিল? উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৫ সালে গান্ধী নেহরুকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ছিল বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির

স্বারা নির্দেশিত। কিন্তু এর মানে নিষ্ক্রিয়তার নীতি বা রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের কাছে নতিস্বীকার, বা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস, এর কোনটিই ছিলনা। গান্ধী বলেছিলেন যে এই নয়া নীতি "জনগণের ক্ষমতার সংহতকরণ, এই মূল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৩৯] উপরন্তু, আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ১৯৩৪-এর অগস্ট মাসে তিনি নেহরুকে বলেন, "সময়ের প্রয়োজনটিকে বোঝার একটা ক্ষমতা আমার আছে বলে আমার ধারণা। আমার সংকল্পগুলি সেই উপলব্ধিরই প্রতিক্রিয়া।"[৪০] তাঁর **আত্মজীবনীতে** গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লেখেন যে ১৯১৮-র খেড়া সত্যাগ্রহের সময় গবাদি পশু, অস্থাবর সম্পত্তি এবং জমির ফসল ক্রোক করার সরকারী নীতি কৃষকদের ভীতসন্ত্রস্ত করেছিল। তারা ভূমিরাজস্ব দিচ্ছে এবং "নিঃশেষিত" হয়ে গেছে দেখে গান্ধী "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে ইতস্তত করেন" এবং "আন্দোলন শেষ করার একটি সুন্দর উপায়ের সন্ধান করতে" শুরু করেন।[৪১] একইভাবে ১৯২২-এর গোড়ার দিকে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি দুর্লভ বিশ্লেষণ করে তিনি ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে লেখেন: "স্বরাজের জন্য যুদ্ধ যখন বহুদিন গড়াল এবং খিলাফৎ যখন আর একটি প্রাণবন্ত বিষয় রইলনা, তখন উৎসাহে ভাঁটার টান পড়ল, নীতি হিসাবে অহিংসার আস্থাভাজনতা নাড়া খেতে শুরু করল, ঘটল অসত্যের অনুপ্রবেশ। অহিংসা ও সত্য, এই দ্বৈতধর্মে এবং খদ্দর পরিধান সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে যাদের আস্থা ছিলনা, সেইসব মানুষেরা ঢুকে পড়তে লাগল, অনেকে এমনকি খোলাখুলিই কংগ্রেস সংবিধানকে অমান্য করতে লাগল।"[৪২] কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহারের বিষয়টি, এবং তার প্রেক্ষিতে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে বোধহয় শ্রেষ্ঠ তত্ত্বটি দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৮ ও ১৯৩৯-এর দুটি বিবৃতিতে: "একজন বিচক্ষণ সেনাপতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়া অবধি যুদ্ধ করেন না। যে অবস্থানকে তিনি ধরে রাখতে পারবেন না বলে জানেন সেখান থেকে তিনি সময় থাকতেই সুশৃংখলভাবে সরে আসেন।" এবং: "একজন দক্ষ সেনাপতি সবসময় যুদ্ধ চালান তাঁর নিজস্ব সময়মাফিক, তাঁর পছন্দসই রণভূমিতে। এসব ব্যাপারে প্রথম চাল চালার ক্ষমতা সবসময় থাকে তাঁরই হাতে, তাকে তিনি কখনোই শত্রুর হাতে চলে যেতে দেননা। একটি সত্যাগ্রহের যুদ্ধে লড়াইয়ের ধরণ এবং রণকৌশলের নির্বাচন—যেমন, এগোতে হবে না পিছোতে হবে, নাগরিক প্রতিরোধ সংগঠিত হবে, নাকি গঠনমূলক কর্মোদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, মানবিক সেবাকর্মের মাধ্যমে অহিংস-শক্তি গড়ে তোলা হবে, ইত্যাদি —স্থির করা হয় পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে।"[৪৩]

যে বক্তব্যে আমরা জোর দিতে চাই তা হল এই যে, জাতীয় আন্দোলনের

যে সমালোচনা শুধুই আন্দোলনের প্রতিটি সরে-আসার ঘটনাকে বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রমাণ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, কিন্তু এই সরে-আসাগুলি যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আন্দোলনের সেই সমগ্র সমরপরিকল্পনার প্রেক্ষিতের কোনও ব্যাপকতর, সাধারণ সমালোচনার মধ্যে যায়না, তা কোনও সমালোচনাই নয়। অন্যদিকে, আন্দোলনের মূল সমরপরিকল্পনাগত প্রেক্ষিতকে যাঁরা মেনে নেন তাঁদেরও অবশ্যই বিচার করতে হবে যে প্রতিটি প্রত্যাহার বা পশ্চাদপসরণের ঘটনা সঠিক সময়ে অথবা সঠিক রীতিতে সম্পাদিত হয়েছিল কিনা। প্রকৃত আন্দোলনের নেতৃবর্গ সম্পর্কে বলতে গেলে, তাঁদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হত যে কোনও মুহূর্তে—আন্দোলনের শক্তি বা দুর্বলতা, জনসাধারণের লড়ে যাবার ক্ষমতা, এবং সরকারের রাজনৈতিক শক্তির ভাণ্ডার সম্পর্কে তাঁদের ধারণার ভিত্তিতে। একইভাবে, প্রশ্ন এটা ছিলনা যে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হওয়া উচিত কি উচিত নয়। প্রশ্ন ছিল, কখন তা হবে, সঠিক মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে হবে কিনা, কিভাবে এবং কি কি বিষয়ে হবে, তার ফলাফল কি দাঁড়াবে, এবং সমঝোতা যদি হয় তবে তার শর্ত কি কি হবে।[৪৪]

ছয়

গান্ধীর সমর পরিকল্পনায় গঠনমূলক কাজকর্মের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত খাদি, চরকা ও গ্রামীন শিল্পের প্রসারবৃদ্ধি, জাতীয় শিক্ষা ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, অস্পৃশ্যতাবিরোধী সংগ্রাম হরিজনদের সামাজিক উন্নয়ন, এবং বিদেশী বস্ত্র ও সুরাবর্জনকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল এই কর্মোদ্যোগ। সর্বোপরি এর অর্থ ছিল গ্রামে যাওয়া এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। দেশব্যাপী শত শত আশ্রম, যার প্রায় সবগুলিই ছিল গ্রামাঞ্চলে, এবং যেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা খাদি ও সুতোর উৎপাদন এবং নিম্নবর্ণের ও আদিবাসী মানুষদের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারে হাতে-কলমে শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যেই রূপ পেয়েছিল গঠন-মূলক কর্মোদ্যোগ।

গঠনমূলক কাজকর্ম স্থান ছিল অবস্থানের লড়াইয়ের ভিত্তি স্বরূপ। 'নিষ্ক্রিয় পর্যায়ে' এর ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আইন অমান্যের প্রত্যাহার যে রাজনৈতিক শূণ্যতার সৃষ্টি করত তা ভরাট করে এটি সেই কেন্দ্রীয় সমস্যার সমাধান করত, যার মুখোমুখি প্রত্যেক গণ-আন্দোলনকেই হতে হয়—সংগ্রামের যে পর্যায়গুলিতে আন্দোলন গণভিত্তিক থাকেনা তখন সক্রিয়তার একটি বোধকে কিভাবে বজায় রাখা যায়? আন্দোলনের প্রত্যাহার, নৈরাশ্য ও অবসাদের অনুভূতির জন্ম দিত। গণ-আন্দোলন যে সার্বিক উৎসহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করত তার থেকে সক্রিয়

রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনীশক্তি গ্রহণ করার উপায় থাকত না। এই সমস্যার একটি সমাধান ছিল গঠনমূলক কর্মোদ্যোগ, কারণ গণআন্দোলন বিক্ষিপ্ত হলেও গঠনমূলক কাজকর্ম চালানো যেত সবসময়েই। বিশেষত যাদের সংসদীয় কার্যকলাপে কোনও উৎসাহ ছিল না তারা এর মধ্যে পেয়েছিল অবিরাম ও ফলোৎপাদক কাজকর্মের একটি বিকল্প উপায়। ১৯৩৫-এ গান্ধী তাই কিছুটা আস্থার সঙ্গেই লিখতে পেরেছিলেন: "আমাকে বলা হয়েছে যে যেহেতু জেলে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই সর্বত্র হতাশা আর অবসাদ, চারদিকে বিরাজ করছে নৈরাশ্য। আমাকে বলা হয়েছে যে জনসাধারণ জানেনা তারা কি করবে। আমি জানিনা কেন, যখন গঠনমূলক পরিকল্পনার পুরো কাজটাই করার রয়েছে।"[৪৫]

গঠনমূলক কার্যকলাপের আরেকটি সুবিধা ছিল এই যে এতে প্রচুরসংখ্যক লোককে জড়িত করা যেত। সংসদীয় ও বৌদ্ধিক কাজকর্ম অল্প লোকই করতে পারত, গঠনমূলক কার্যকলাপে যোগ দিতে পারত লক্ষ লক্ষ মানুষ।[৪৬] উপরন্তু, বহুবিধ কারণে সবার পক্ষেই জেলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু দেশের জন্য যৎসামান্য সাহায্য করতে ইচ্ছুক, এমন যে কোনও ব্যক্তির আয়ত্তাধীন ছিল গঠনমূলক কাজকর্ম।[৪৭]

গঠনমূলক কর্মীদের মূল শক্তিশালী অংশ, বিশেষত আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে আবার আইন অমান্য আন্দোলনগুলি পেয়েছিল প্রচুর সংখ্যক যোদ্ধা। অগ্রণী গঠনমূলক কর্মীদের প্রায় সবাই বিভিন্ন সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সময় কারাবরণ করেছিলেন।[৪৮] এঁরাই ছিলেন গান্ধীর ইস্পাতকাঠামো। এঁরাই আবার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রামীণ জনসাধারণের সংযোগের ধমনী হিসাবেও কাজ করেছিলেন। গান্ধীর অদ্ভুত সহজাত রাজনৈতিক অনুপ্রাণনার একটি রহস্য ছিল তাঁর জনসংযোগ। এটি তিনি রক্ষা করতেন গঠনমূলক কর্মীদের মাধ্যমে, যাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ বা ডাকযোগে অবিরাম যোগাযোগ রাখতেন।

গঠনমূলক কর্মীরা ছিলেন কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উদ্দেশ্যে তাঁদের কাজ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল— যা ছিল যে কোনও বিচারেই একটি প্রধান কাজ। কৃষিশ্রমিকদের প্রধান অংশ, অর্থাৎ হরিজন এবং আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কাজও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এদের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সমর্থন ছাড়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কোনও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এধরণের কাজ না হলে সংগ্রামের সময় গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সরকারী প্রচেষ্টারও তারা শিকার হয়ে পড়তে পারত। খাদি এবং হরিজন সংক্রান্ত কাজকর্মের আরেকটি তাৎপর্য ছিল। বহু শতাব্দী ধরে নিপীড়িত জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া তাদের কোনও ধরণের সংগ্রামেই

যোগদানের কথা কল্পনা করানো যেত না। বর্তমানের ভ্রান্তধারণাগুলিকে খণ্ডন করে বলা যায় যে অত্যন্ত দরিদ্র এবং নীতিভ্রষ্ট মানুষদের পক্ষে লড়াই করা সহজ নয়।[৪৯] গঠনমূলক কর্মোদ্যোগ সমাজের এই অংশগুলিকে নতুন আশায় পূর্ণ করেছিল, তাদের নির্ভীক হতে সাহায্য করেছিল এবং শিখিয়েছিল, আত্মনির্ভর করেছিল, এবং তাদের মধ্যে অন্তত কিছুসংখ্যক লোককে সক্ষম করেছিল স্বাধীনতা তথা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে।[৫০]

সাত

সাংবিধানিক ও সাংবিধানিক সংস্কারের মোকাবিলা কংগ্রেস যেভাবে করতে শিখেছিল তার থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কংগ্রেসী সমরপরিকল্পনার জটিলতা এবং কি সূক্ষ্মভাবে তা গড়ে উঠেছিল ও কাজ করত। প্রথমোক্ত জিনিসগুলি ছিল সমান জটিল ঔপনিবেশিক সমরপরিকল্পনা এবং ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আধা-প্রভুত্ববাদী চরিত্রের একটি মুখ্য উপাদান। কিভাবে একটি আধিপত্যকামী সংগ্রাম লড়া হয়ে থাকে তার একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে ঔপনিবেশিক ও কংগ্রেসী সমর পরিকল্পনার মিথষ্ক্রিয়ার (interplay) আলোচনা। কিন্তু এই আলোচনা এখানে আমরা করতে পারি কেবল খুব সংক্ষেপে।

যেহেতু রাষ্ট্রই ছিল জাতীয় আন্দোলন আর ঔপনিবেশিক সরকারের মধ্যেকার সংগ্রামের রণক্ষেত্র, অতএব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কারগুলি শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব বিস্তারের সমরপরিকল্পনার দিক তথা অস্ত্র ছিল না ; একইসঙ্গে তারা ছিল উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামেরও ফল— অর্থাৎ সেই জমি যা উপনিবেশবাদ জাতীয়তাবাদী চাপের ফলে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, অথবা ক্রমাগত পরিবর্তমান শক্তিসাম্যের একটি নিরিখ। এরা ছিল একইসঙ্গে উপনিবেশবাদের দলে-টানার অস্ত্র, এবং একটি প্রসরমান গণতান্ত্রিক ক্ষেত্র যার মধ্যে থেকে জাতীয় আন্দোলন কাজ করতে পারত। রাষ্ট্রের আধা-প্রভুত্ববাদী চরিত্রের কারণেই ঔপনিবেশিক শাসকেরা কিছু সাংবিধানিক সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা সার্বিক দমনের যুক্তিটিকে অনুসরণ করতে পারেননি ; দমন শুধু একটি আংশিক ও স্বল্পমেয়াদী কৌশল হতে পারত। জাতীয়তাবাদী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য, এবং অবশেষে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য তাঁদের দমন-নির্ভর নয়, এমন পদ্ধতিরও উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। তাদের সামনে পথ খোলা ছিল হয় এটা করা নয় তাদের শাসনের আধা-প্রভুত্ববাদী চরিত্র বর্জন করা এবং প্রভুত্ববাদী লড়াইয়ের রণভূমি থেকে সরে আসা। শাসিতের এবং

স্বদেশের জনমতের কাছে তাদের ক্রমাগত নিজেদের শাসনকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে হত, অথবা খোলাখুলিই বাহুবলের উপর শাসন টি'কিয়ে রাখতে হত।

কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিভেদের সৃষ্টি করে এবং ঔপনিবেশিক সাংবিধানিক তথা প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এর প্রধান অংশগুলিকে টেনে এনে বা একত্র করে ব্রিটিশরা জাতীয় আন্দোলনকে দীর্ঘমেয়াদীভাবে দুর্বল করতে এবং এর তুলনায় নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। এজন্য দমনের প্রতিটি পর্যায়ের পরেই এসেছিল সাংবিধানিক সংস্কারের পর্যায়।[৫১] অমোঘভাবে সংস্কারগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ: অবৈধ উপায় অবলম্বনের নিষ্প্রয়োজনীয়তা এবং সাংবিধানিকতার, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক কাঠামোর পরিধির ভিতর থেকে কাজ করার, সার্থকতা সম্পর্কে বৃহৎসংখ্যক কংগ্রেসীদের বিশ্বাসোৎপাদন করা। এও আশা করা হয়েছিল যে একবার সংসদীয় সুযোগসুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতার (এবং পরে পদাধিকারের) স্বাদ পেলে কংগ্রেসীরা আর কিছুতেই গণরাজনীতি বা ত্যাগের রাজনীতিতে ফিরে যেতে চাইবেন না। নীতিভ্রষ্ট সাধারণ কংগ্রেসীদের মধ্যে সংবিধানপন্থী বনাম সংবিধান-বিরোধী, দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থী, এধরণের মতানৈক্য বা বিভেদ সৃষ্টির কাজেও সংস্কারগুলিকে ব্যবহার করা যেত। ঠিক করা হয়েছিল যে সাংবিধানিক ও অন্যান্য ছাড়ের মাধ্যমে সংবিধানপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মন ভিজিয়ে তাদের সংসদীয় দাবাখেলায় টেনে আনা হবে; এরপর তাদের উদারনৈতিক নরমপন্থী, ভূস্বামী এবং অন্যান্য রাজভক্তদের সঙ্গে একযোগে সংস্কৃত সংবিধানটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হবে, এবং অবশেষে তারা জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।[৫২] আশা করা হয়েছিল যে চরমপন্থী, গান্ধীবাদী এবং বামপন্থীরা পুরো ব্যাপারটিকেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস এবং গণরাজনীতির মঞ্চ থেকে প্রস্থান হিসাবে দেখবে, এবং হয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবে নয় তার থেকে বিতাড়িত হবে। দুভাবেই কংগ্রেসকে বিভক্ত ও দুর্বল করা যেত। উপরন্তু সংবিধানপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন চরমপন্থী বা র‍্যাডিক্যাল উপাদানগুলিকে পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে গুঁড়িয়ে দেওয়া যেত।[৫৩] আবার এই কারণেই ১৯৩৫-এর পর থেকে ঔপনিবেশিক সরকার আর বামপন্থী কংগ্রেসীদের বৈপ্লবিক বিক্ষোভের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেননি।[৫৪] তিরিশের দশকে এও আশা করা হয়েছিল যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি কংগ্রেসের মধ্যে শক্তিশালী প্রাদেশিক নেতাদের সৃষ্টি করবে, যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাধীন ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াবেন। এর ফলে কংগ্রেসের প্রাদেশিকীকরণ (provincialisation) ঘটবে এবং এর কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কর্তৃত্ব বিধ্বস্ত না হলেও হ্রাস-

প্রাপ্ত হবে।[৫৫] উপরন্তু আশা করা হয়েছিল যে বিশের দশকের দ্বৈতশাসন এবং ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিষয়গুলির দিকে জনসাধারণের মন ঘুরিয়ে দেবে ; তারা কেন্দ্রীয় বা প্রাথমিক বৈপরীত্য-টিকে ভুলে যাবে, বা অন্তত তার উপর মনোনিবেশ করবে না।

অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল সমান জটিল এবং অন্তিম বিচারে, সংস্কারগুলির দ্বৈত চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিক্রিয়া যে তৎক্ষণাৎ গড়ে ওঠেনি তা ভালোভাবেই জানা ; এটি গড়ে উঠেছিল বহু বছরের সংঘর্ষ ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। বিশের দশকে গান্ধী কঠোরভাবে কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী ছিলেন।[৫৬] তিরিশের দশকে তাঁর বিরোধিতার তীব্রতা কমে আসে, কিন্তু তিনি সংসদীয় কাজকর্মের সমর্থক হয়ে দাঁড়ান কেবল ১৯৩৭-৩৮ নাগাদ। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত নেহরু ছিলেন পদ গ্রহণের বিরোধীদের পুরোধা, কিন্তু ১৯৩৭-এ তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে।[৫৭]

সংস্কারগুলির যুক্তি এবং তাদের নিজস্ব সমরপরিকল্পনার যুক্তি, দুটিই জাতীয়তাবাদীদের অনুসরণ করতে হয়েছিল। প্রভুত্ববাদী সংগ্রামের জন্য কোনও ক্ষেত্র বা ভূমি উন্মুক্ত হলেই সেটিকে অধিকার করতে হত ; এটি পরিত্যাগ করার উপায় ছিল না, বরং একে ব্যবহার করতে হত সৃজনশীল কিন্তু ছকে-না বাঁধা পদ্ধতিতে। সংস্কারগুলিকে ব্যবহার করতেই হত ; কিন্তু কিভাবে, সেটাই ছিল প্রশ্ন। মূলত এর উত্তর ছিল ঔপনিবেশিক সরকার যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে সংস্কারগুলিকে ব্যবহার না করে, এর জন্য একটি বিকল্প উপায়—যা সাম্রাজ্যবাদী হিসেব-নিকেশ পণ্ড করে দেবে এবং জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—উদ্ভাবন ও অনুসরণ করা।[৫৮] ১৯৩৫-৩৬-এ না হলেও পরে যা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল, কংগ্রেসী মনোভাবের সেই যুক্তিটিকে ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে নেহরুকে লেখা একটি চিঠিতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অত্যন্ত সরলভাবে ব্যক্ত করেন :[৫৯]

> আমার বিচারে, যতদূর মনে হয় কেউই নিছক পদপ্রাপ্তির জন্যই পদ চায় না। সংবিধানকেও কেউই সরকারের পছন্দসই রীতিতে ব্যবহার করতে চায় না। আমাদের ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ আলাদা। এই সংবিধান দিয়ে আমরা কি করব ? আমরা কি একে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করব আর নিজেদের রাস্তায় চলব ? সেটা কি করা সম্ভব ? আমরা কি একে দখল করব এবং একে আমাদের পছন্দমাফিক যতদূর ব্যবহার করা যায় ততদূর করব ? তথাকথিত পরিবর্তনকামী বা পরিবর্তনবিরোধী, সহযোগী বা বাধা-প্রদানকারী ইত্যাদি প্রাক্-ধারণার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের আগেভাগে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

এবং তিনি নেহরুকে আশ্বাস দেন যে :

আমি বিশ্বাস করি না যে কেউ অসহযোগ-পূর্ববর্তী মানসিকতায় ফিরে গেছে। আমি মনে করি না যে আমরা ১৯২৩-২৮-এর সময়ে ফিরে গেছি। আমাদের মধ্যে রয়েছে ১৯২৮-২৯-এর মানসিকতা এবং আমি নিঃসন্দেহ যে শীঘ্রই সুদিন আসবে।

শত্রুপক্ষের সঙ্গে সহযোজনের (cooption) বিপদটিক বিশ ও তিরিশের দশকে স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা হয়েছিল, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী হিসেবে দেখা হয়নি। ঔপনিবেশিক সমরপরিকল্পনাকে ব্যর্থ করা এবং ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেও কাউন্সিলের কাজকর্ম, তথা পরবর্তী সময়ের পদগ্রহণকে ব্যবহার করা যেত। যেমন ১৯৩৬-এ একজন কংগ্রেসী বলেছিলেন : "মন্ত্রিসভাগুলিকে দেখ পদ বা করণ (office) হিসেবে নয়, বরং ঘাঁটি এবং দুর্গ হিসেবে, যেখান থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিচ্ছুরিত হয়···কাউন্সিল আমাদের সাংবিধানিকতার পথে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ আমরা শিশু নই ; আমরাই কাউন্সিলগুলিকে চালনা করব এবং বিপ্লবের জন্য তাদের ব্যবহার করব।"[৬০] বস্তুত, ১৮৮০-র দশক থেকে শুরু করে বেশির ভাগ কংগ্রেসীই কাউন্সিল ও পদকে দেখেছিলেন জাতীয়তাবাদী আধিপত্যের গঠন ও সম্প্রসারণের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে।

এই মতও পোষণ করা হয়েছিল যে এত সুবিধাজনক অবস্থান পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ১৮৯২, ১৯০৯, ১৯১৯, ১৯৩৪, ১৯৩৭-এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে এবং সংস্কার-গুলিকে কার্যকর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। নিশ্চিতভাবেই এর থেকে সরকার কিছু পরিমাণ বৈধতা অর্জন করতে পারত। উপরন্তু যদি কংগ্রেস সংস্কারগুলিকে ব্যবহার নাও করত, সেক্ষেত্রে সরকারের অনুগত অন্য বহু গোষ্ঠী ও দল ছিল যারা তা করতে ইচ্ছুক ছিল। কংগ্রেস যদি তাদের রাস্তা ছেড়ে দিত, তাহলে তারা জাতীয়তাবাদের শক্তিক্ষয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক নীতি ও রাজনীতিকে উৎসাহিত করার কাজে বিধানসভা এবং পরে মন্ত্রিমণ্ডলীগুলিকে ব্যবহার করত।

সবশেষে, প্রাদেশিক আইনসভা ও পরে মন্ত্রিসভাগুলিকে (যেগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল জাতীয়তাবাদীদেরই অতীত প্রচেষ্টার ফল), তাদের সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও, গঠনমূলক কাজকর্মের প্রসারের উদ্দেশ্যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবর্তনে বাধ্য করতে, এবং অভাবী জন-সাধারণের ত্রাণ বা সাহায্যের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেত এবং হয়েছিল।[৬১]

কাউন্সিল, পৌর প্রতিষ্ঠান ও পরে মন্ত্রিসভাগুলির কাজকর্মকে জন-সাধারণের মধ্যে স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে এবং কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দো-লনের জন্য মর্যাদা অর্জনের কাজেও ব্যবহার করা যেত। যেসব লোকেরা

দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিল—এবং দেশের বৃহদংশ সমস্ত ধরণের ক্ষমতা থেকেই বঞ্চিত ছিল—এবং ঔপনিবেশিক মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে মেনে নিয়েছিল যে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার করতে অপারগ এবং ঔপনিবেশিক শাসকেরা অপ্রতিরোধ্য, তাদের স্বীয় যোগ্যতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের বোধে বড় রকমের ইন্ধন যুগিয়েছিল ফিরোজশাহ্ মেহ্তা আর জি. কে. গোখেলের শক্তিশালী ভাষণ, বিশের দশকে বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের হাতে সরকারের পরাজয়, তিরিশের দশকে কংগ্রেসের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপাদানের ব্যবহার, এবং জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পৌর ক্ষমতার প্রয়োগ।[৬২] কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি তাদের নিজের নিজের প্রদেশে পৌর স্বাধীনতার ব্যাপক সম্প্রসারণ করেছিল, এবং এর ফলে কৃষক, ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র আন্দোলনগুলির অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয়েছিল।[৬৩]

কংগ্রেসের এইসব হিসেবনিকেশ ও প্রতি-সমরপরিকল্পনা (Counter strategy) যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। জাতীয় আন্দোলন যখন তার শক্তি পুনরুদ্ধার করছিল সেই সময়টিতে কাউন্সিলের কাজকর্ম রাজনৈতিক শূণ্যতা পূর্ণ করেছিল। এবং কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, যাঁরা এগুলিতে কাজ করতেন তাঁরা মোটের উপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোজন এড়িয়ে চলেছিলেন—আর যাঁরা তা পারেন নি তাঁরা খুব তাড়াতাড়িই কংগ্রেস ও দেশের মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হারিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে পণ্ড করার বিনিময়ে অল্প কয়েকজনকে হারানো মূল্য হিসেবে সামান্যই ছিল। বিশের দশকে স্বরাজবাদীরা এবং ১৯৩৯-এ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি চাওয়ামাত্র তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসী পদ্ধতির সাফল্য এবং দলীয় সংহতি প্রদর্শন করেন। বিরাটাকার সংখ্যা-গরিষ্ঠরা সুশৃঙ্খলভাবে আইনপরিষদ ও মন্ত্রিসভাগুলিতে কাজ করেছিলেন। সর্বোপরি ফিরোজশাহ্ মেহ্তা ও গোখেল থেকে শুরু করে মোতিলাল নেহরু এবং ১৯৩৭-৩৯-এর কংগ্রেসী মন্ত্রী ও বিধায়কেরা দেখিয়েছিলেন যে স্বনির্ভর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতির প্রসারের উদ্দেশ্যে আইনসভা ও পদগুলিকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। ঔপনিবেশিক শাসনের শূন্যগর্ভতাও তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেন এবং জনসাধারণকে দেখান যে ভারতবর্ষ তখনও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের স্বার্থে ব্রিটেন থেকেই শাসিত হচ্ছিল, আর নিজেদের স্বার্থে শাসকরা যখনই চাইত তখনই এ-ব্যাপারে আশ্রয় নেওয়া হচ্ছিল "যথেচ্ছাচারী আইনের"।

কংগ্রেস বিভেদও এড়াতে পেরেছিল। বিশের দশকে গান্ধী ও গান্ধী-বাদীরা এবং ১৯৩৬-৩৯-এর সময় বামপন্থীরা ঔপনিবেশিক শাসকদের পাতা ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেন। কংগ্রেসের 'প্রাদেশিকীকরণ'-ও বাস্তবে ঘটেনি ; ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত পুরো সময়টাই কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি

একটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সংসদীয় পর্ষৎ (Congress Parliamentary Board) এবং কংগ্রেস কার্যনির্বাহিক সমিতির (Working Committee) দ্বারাই নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল ; এদের নির্দেশেই ১৯৩৯-এ তারা সবাই পদত্যাগ করে।

এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল কারণ ১৯২০-র পরে জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে আর কোনও প্রকৃত সংবিধানপন্থী ধারা বা স্রোত ছিল না। একমাত্র সত্যাগ্রহই স্বাধীনতা এনে দিতে পারে, এই মতের প্রতি অবশ্য গান্ধী ও নেহরু কঠোরভাবে নিবেদিত ছিলেন।[৬৪] কিন্তু মূলত এই ব্যাপারটি সত্য ছিল প্রায় সমস্ত কংগ্রেসীদের ক্ষেত্রেই, যার মধ্যে ছিলেন যাঁরা বিশের দশকে কাউন্সিল-প্রবেশ আর তিরিশের দশকে পদ-গ্রহণের পক্ষপাতী, যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সাংবিধানিক কাজকর্ম ছিল একটি স্বল্প-মেয়াদী কৌশলী পদক্ষেপ যা জাতীয় আন্দোলনকে নিতে হয়েছিল তার সেই মুহূর্তে আবার বৈধতা-অতিরিক্ত গণ-আন্দোলন শুরু করার অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন যে "আসল কাজ পড়ে রয়েছে আইনসভার বাইরে", এবং যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আইন ও সংবিধানের কাঠামোর বাইরে গণসংগ্রামের পথ অবশ্য প্রয়োজনীয়।[৬৫] এর দুটি সাংবিধানিক পর্যায়েই সমস্ত কংগ্রেসীরা একমত হয়েছিলেন যে গণ-রাজনীতির সঙ্গে আইনসভা ও মন্ত্রিসভাগুলির কাজকর্মকে সমন্বিত করা উচিত—এবং বাস্তবিক, তাঁরা এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করেছিলেন ;[৬৬] যখন ১৯২৮-২৯, ১৯৩০, এবং আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিস্থিতি গণআন্দোলনের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে তখন সাংবিধানিক কাজকর্ম অথবা সংবিধানপন্থীরাও তাদের উত্থানের পথে বাধাবিস্তার করেনি।

সর্বোপরি, সাংবিধানিক কাজকর্ম-সংক্রান্ত কংগ্রেস সমরপরিকল্পনা কোনও সংস্কারপন্থী ছকের নয়, পরন্তু একটি বৈপ্লবিক ছকের অংশ ছিল। ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোগুলির ক্রমিক সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিস্থাপন (replacement), যদিও এই প্রতিস্থাপন আসবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে, রাষ্ট্রদখলের মাধ্যমে নয়।[৬৭] আইনসভা-গুলিকে দেখা হত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রূপান্তরের আঙিনা হিসেবে নয়, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্র হিসেবে। এটি ছিল আরেকটি কারণ যার জন্য কংগ্রেস বা কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের সহযোজন অসম্ভব ছিল। জনান্তিকে আমরা বলতে পারি যে গান্ধী এবং তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপীয় সোশ্যাল ডেমক্রাটদের (Social Democrats) মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য নিহিত ছিল এখানেই। গান্ধী সংস্কার এবং আপোসের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু চেয়েছিলেন প্রতি-ঔপনিবেশিক

বিপ্লব; সমাজগণতন্ত্রীরা ব্যবহার করেছিলেন বিপ্লবের ভাষা, কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাঁদের পুরোপুরিই দলে টানতে পেরেছিল।

আট

অহিংসা ছিল একটি বহুবর্ণ প্রত্যয় এবং ঘটনা। এর যে দিকগুলি জাতীয় আন্দোলনের সামগ্রিক সমরপরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত, আমরা এখানে শুধু সেগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করব, কারণ রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতা ও আচরণের একটি ধরণ হিসেবে এটি ছিল এই পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। বস্তুত কংগ্রেসের একেবারে গোড়ার থেকেই অহিংসা তার সমর পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। এটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের অন্ধবিশ্বাস[৬৮] বা বিত্তবান শ্রেণীর বুদ্ধিমান চালাকিই ছিল না। ব্যাপক গণ-উদ্‌যোজনের (mass mobilisation) উপর প্রতিষ্ঠিত প্রভুত্ববাদী সংগ্রাম হিসেবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের যে চারিত্র্য, তার সঙ্গে কয়েকটি অপরিহার্য দিক দিয়ে এটি ছিল অখণ্ডতার সূত্রে গ্রথিত। একই সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের **বিশিষ্ট পার্থক্যের** (differentia specifica) সূত্রটি ছিল এর অহিংস সংগ্রামপদ্ধতি নয়, বরং এর প্রভুত্ববাদী ও গণমুখী চরিত্র। এই চরিত্রের জন্যই অহিংসা এর অন্যতম মৌলিক উপাদান হয়ে উঠেছিল।

অহিংস সংগ্রামপদ্ধতির পরিগ্রহণ সেইসব জনগণের যোগদানকে সম্ভব করেছিল, যাদের পক্ষে একটি সহিংস উপায় অবলম্বনকারী আন্দোলনে একইভাবে অংশগ্রহণ করা বা সমান গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। অবদমন এবং অন্যান্য বিচারে একটি হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনে যোগদান করলে 'ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা' অবশ্যই অনেক বেশি থেকে যায়, এবং [ফলে] তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক লোকই এতে যোগদান করতে চায়। হিংসাত্মক কার্যকলাপে যোগদান, তা সে সন্ত্রাসবাদী বা গেরিলা ধরণেরই হোক আর মুক্তিবাহিনীর মধ্যেই হোক, তার সঙ্গে জড়িত থাকে বাড়ি থেকে দীর্ঘ অনুপস্থিতি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ ছেদ, স্বাভাবিক জীবিকানির্বাহের সম্পূর্ণ বর্জন, এবং জীবনহানি। অহিংস সংগ্রামের সঙ্গে কারাবরণ এবং স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যাঘাত জড়িত থাকলেও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনার বিচারে এধরণের সংগ্রাম গুণগতভাবে আলাদা। উপরন্তু, গ্রেফ্‌তারবরণের চূড়ান্ত পদক্ষেপটি ব্যতিরেকেও এর ভিতর যোগদানের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যাই হোক, হিংসাত্মক কার্যকলাপের তুলনায় এক্ষেত্রে দমনের তীব্রতা যে অনেক কম হবে, এই জ্ঞান বহু লোককে—বিশেষত দরিদ্র অংশগুলির মধ্যে অনেককে—যোগদান করতে উৎসাহিত করেছিল। আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের অনেকেই জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদান করতে সক্ষম করার ব্যাপারে অহিংসার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন।[৬৯] বহুসংখ্যক

মহিলা অংশগ্রহণকারীরাও আমাদের বলেছেন যে অহিংসা তাঁদের সংগ্রামে যোগদানের সুবিধা করে দেয়; পারিবারিক প্রতিরোধ, দমনের ভয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলি তাঁরা একটি হিংসাত্মক আন্দোলনে যোগ দিতে চাইলে যতখানি জোরদার হত, তার থেকে এক্ষেত্রে অনেক কম ছিল। এঁরা বলেছিলেন যে মহিলাদের পক্ষে দলে দলে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান করা যে কোনও পরিস্থিতিতেই কঠিন ছিল। কিন্তু এঁরা এও বলেছেন যে ক্লেশস্বীকার, লাঠিচার্জের মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে মহিলারা সম্ভবত পুরুষদের চেয়ে শক্ত ছিলেন।[৭০]

সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আচরণের একটি ধরণ হিসেবে অহিংসা অবশ্যই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আধা-প্রভুত্ববাদী চরিত্র এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিধির গণতান্ত্রিক চরিত্রের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল। 'শত্রুর' প্রতি, অর্থাৎ ভারতের ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের প্রতি শিষ্ট ব্যবহারও ছিল অহিংসার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ ছিল প্রতিপক্ষের 'সূক্ষ্মতর বোধগুলির' প্রতি আবেদন করা; সর্বোপরি এর অর্থ ছিল নৈতিক শক্তির রণভূমিতে যুদ্ধ করা। অবশ্য আমরা তো ইতিমধ্যেই দেখেছি যে নৈতিক শক্তির অঙ্গনই হল প্রভুত্ববাদী লড়াইয়ের রণভূমি।

যখনই সরকার শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করত তখনই অহিংস গণআন্দোলনের তুলনায় প্রতিপক্ষের নৈতিক ভ্রষ্টতা প্রমাণিত হত, বেরিয়ে পড়ত রাষ্ট্রশক্তির দমনমূলক ভিত্তি। বস্তুত, অহিংস গণআন্দোলন শাসকদের উভয়সংকটে ফেলে দেয়।[৭১] এটি শান্তিপূর্ণ ছিল বলে যদি তারা এটিকে দমন করতে ইতস্তত করত, তাহলে তারা তাদের প্রভুত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে বসত, কারণ আইন-প্রতিরোধকারীরা (civil resisters) বাস্তবিকই আইন ভঙ্গ করত, এবং তাদের শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ ছিল প্রশাসনিক কর্তৃত্বের পরিত্যাগ এবং শাসন করার অক্ষমতা বা শক্তির অপ্রতুলতাকে স্বীকার করে নেওয়া। এর ফলে বিদেশী শাসনের ভিত্তি—যা নির্ভরশীল ছিল আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে অল্পসংখ্যক বিদেশীর, এবং অল্প কয়েকজন রাজভক্ত ভারতীয়ের উপর—প্রবলভাবে নাড়া খেত। আর যদি তারা আন্দোলনকে দমন করত তাহলেও তারা হেরে যেত, কারণ শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের এবং অহিংস আইনভঙ্গকারীদের অবদমনকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করা নৈতিকভাবে কঠিন ছিল। করলেও নিন্দার্হ, না করলেও নিন্দার্হ, এরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে তারা পড়েছিল। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনের সমরপরিকল্পনার বিজয় ছিল সুনিশ্চিত: একটি অহিংস এবং ব্যাপক জনসমর্থনের অধিকারী গণআন্দোলনের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা বস্তুত আধা-গনতান্ত্রিক শাসনের ছিল না। বাস্তবে ঔপনিবেশিক সরকার

ক্রমাগত এই দুই বিকল্পের মধ্যে টলমল করত, এবং সাধারণত অবশেষে অবদমনের পক্ষেই রায় দিত। একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অবদমনের আশ্রয় নেওয়ার ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের মূলত শক্তি ও দমননির্ভর ভিত্তিটি প্রকাশিত হয়ে পড়ত, এবং এই কারণে এর প্রভুত্বের ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটত।[৭২] উপরন্তু, গণতান্ত্রিক এবং প্রভুত্ববাদী সমাজের মত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র রাজনীতি ও আদর্শের জমিতে দাঁড়িয়ে গণপ্রতিরোধের মোকাবিলা করতে পারত না। তার নিজস্ব জমিতে—অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলার জমিতে —ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তার প্রভুত্ব অথবা তার নৈতিক ভিত্তি একটু একটু করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।[৭৩]

নিরস্ত্র জনসাধারণের অন্য কোনও উপায় ছিল না, এই সত্যের সঙ্গেও জড়িত ছিল জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা অহিংসার পরিগ্রহণ। একদিকে ১৮৫৮ থেকে শুরু করে একটি বিস্তারিত ব্যবস্থার সাহায্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতীয় জনগণকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকৃত করেছিল, এবং তাদের পক্ষে অস্ত্র সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করতে শেখা দুষ্কর করে তুলেছিল। অন্যদিকে এই রাষ্ট্র ছিল শক্তিশালী, এবং কোনওভাবেই নিষ্ক্রিয় নয়।[৭৪] গোড়ার থেকেই জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বুঝেছিলেন যে এমন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর মত বস্তুগত রসদ ভারতীয়দের হাতে নেই। পক্ষান্তরে, অহিংস সংগ্রামে নৈতিক শক্তিও গণসমর্থনই অগ্রগণ্য এবং এ-ব্যাপারে একটি নিরস্ত্র জাতির কোনও অসুবিধা নেই।[৭৫] অন্যভাবে বলতে গেলে অহিংসা অবস্থানের লড়াইয়ে রাজনৈতিক রসদের দিক দিয়ে একটি সশস্ত্র রাষ্ট্রের সমকক্ষ হবার একটি উপায়ও বটে।

নিরস্ত্র ভারতীয় জনগণ যে প্রবল সরকারী দমন সহ্য করতে পারবেনা, তারা যে এখনও তা করতে শেখেনি. এবং হিংসার প্রয়োগ যে সরকারকে গণ-আন্দোলনের উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত হানার ন্যায্য কারণ দেবে, এই জ্ঞান এখানে ছিল কেন্দ্রীয়।[৭৬] এরকম প্রচণ্ড অবদমন জনগণকে নীতিভ্রষ্ট করত এবং রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দিত।[৭৭] এইভাবে জনসাধারণের সহন-ক্ষমতার পরিধির মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামকে নিয়ে এসে অহিংসা শুধু এর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাকেই হ্রাস করেনি, শাসকদের লজ্জা উৎপাদন করে তাদের সদাচরণেও বাধ্য করেছিল, এবং আরও বাধ্য করেছিল 'তাদের স্বভাবের অপেক্ষাকৃত ভালো দিকটির' সঙ্গে মানানসই কাজকর্ম করতে। আগেই বলা হয়েছে যে অহিংস প্রতিবাদ ও আমলাতন্ত্রের প্রতি শিষ্টাচরণ আমলাদের মনোবলে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল, রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করেছিল, এবং এমনকি তাদের কিছু সদস্যের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। টমাস গে নামে এক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আই. সি. এস. আমাদের বলেন যে প্রত্যাঘাতে সম্পূর্ণ অপারগ বা অনিচ্ছুক নিরস্ত্র

নরনারীর উপর লাঠি চালাতে বাধ্য হওয়ার ব্যাপারটি পাবলিক স্কুলে শিক্ষিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মনোবলকে যতখানি ধ্বংস করেছিল, আর কিছুই ততখানি করেনি।[৭৮] এখানে এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গারের মৌখিক সাক্ষ্য থেকে একটি দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। এখানে তিনি ১৯৩১-এর বোম্বাইয়ের একটি দৃশ্য বর্ণনা করছেন। বোম্বাইয়ের হোম মেম্বার স্যার আর্নেস্ট হট্সনের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া টার্মি-নাসের সমতল ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছিলেন এক বিশাল জনতা নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে একটি শোভাযাত্রা বের করার চেষ্টা করছে, এবং পুলিশ তাদের থামানোর চেষ্টা করছে :[৭৯]

> সেই সময়কার পুলিশ বাহিনীগুলিতে ব্রিটিশ সার্জেণ্টরা থাকত এবং তারা তাদের [শোভাযাত্রাকারীদের] নির্দয়ভাবে প্রহার করছিল। বেশ কিছু লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল কিন্তু শোভাযাত্রা থামেনি। যারা বাধা দেয়না তাদের ক্রমাগত মেরে যাওয়া যায়না। এই অহিংস প্রতিরোধের ফল হয়েছিল এই, যে বোম্বাই শহরের হাজার হাজার লোককে—আমার মনে হয় সারা ভারতকে ধরলে এই সংখ্যা কয়েক লক্ষে দাঁড়াবে—কারাবন্দী করা হয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বলপ্রয়োগ করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি মিছিল আসতে আসতে যখন বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং হিংসাত্মক হতে শুরু করে, তখন আপনার রক্ত গরম হয়ে ওঠে ; আপনি তাদের ইঁটের বদলে পাটকেলটি দিতে চান, এধরণের জনতার প্রতি গুলিবর্ষণে আপনার কোনও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু আপনি যদি একটি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালান এবং সেই লোকগুলি যদি তাও হাত ভাঁজ করে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে, তাহলে পুলিশ মেরে তাদের রক্ত বার করে দিতে পারে ; কিন্তু প্রহৃত লোকটি যদি প্রতিরোধ না করে নীরবে তার শাস্তি নেয়, তবে তাকে ক্রমাগত প্রহার করে যাওয়া যায়না··· সেখানে শিখ, পাঠান এবং অন্যান্য বলিষ্ঠ হিন্দুরা ছিল। তারা মিছিলের সামনে সামনে যাচ্ছিল আর মার খাচ্ছিল—তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ খারাপভাবেই প্রহৃত হয়েছিল। কিন্তু তারা প্রত্যাঘাত করেনি, যার ফলে সার্জেণ্টরা মাথা চুলকোতে শুরু করে—এধরণের পরিস্থিতির সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল না। এর ফল হয়েছিল এই, যে তারা প্রহার করা বন্ধ করে দিয়েছিল। স্যার আর্নেস্ট হট্সন বুঝতে পারছিলেন না কি করতে হবে, কারণ এই লোকগুলি হাতজোড় করে চলে যাচ্ছিল এবং পুলিশ কিছুক্ষণ

> পরে তাদের মারধোর করা থামিয়ে দিচ্ছিল। এই ছিল পরিস্থিতি। এটি ছিল সামগ্রিক লড়াইয়ের অঙ্গাঙ্গী অংশ। এ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে এক অসাধারণ যুদ্ধ, এমন কিছু যার সঙ্গে ব্রিটিশরা নিশ্চিতভাবেই পরিচিত ছিল না। আমার মনে হয় যদি কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে পাথর ছুঁড়ত তাহলে তারা জনতার উপর গুলি চালানোর জন্য বন্দুক বের করত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সরকারী চাকরিতে আমার ইংরেজ সহকর্মীদের অনেকেই আসলে মানুষ হিসেবে ছিলেন ভদ্র ও দয়ালু। যদিও তাঁরা কিছু কিছু জিনিস অপছন্দ করতেন, এবং সম্ভবত কংগ্রেস আন্দোলনকে ঘৃণা করতেন এবং বিনষ্ট করতে চাইতেন, তবু তাঁরা মনেই করতেন না যে আন্দোলন প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় তাঁদের একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যাওয়া উচিত।

এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা থেকে দুটি বৃহত্তর প্রশ্ন উঠে আসে। একটি গণআন্দোলন কি হিংসাত্মক হতে পারে, অথবা—জওহরলাল নেহরু ও ভগৎ সিং তাঁদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্ভাবনাময় বক্তব্যে যেমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—যে গণআন্দোলনে লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দেয়, এবং যা ক্যাডারভিত্তিক আন্দোলনের থেকে আলাদা, তাকে কি নিজস্ব স্বভাবানুসারেই অহিংস হতে হয়?[৮০] দ্বিতীয়ত, একটি আন্দোলনে অহিংসামাত্রকেই অবৈপ্লবিক (non-revolutionary) বলে দেখা উচিত নয়, কারণ রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোর পরিবর্তনকামী প্রভুত্ববাদী সংগ্রামের—অবস্থানের লড়াইয়ের—বৈপ্লবিক সমর-পরিকল্পনার এটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হতে পারে। এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে সত্যি হয় তখনই "যখন একটি আন্দোলনের বৈপ্লবিক চরিত্র এর সংগ্রামের প্রণালী বা উদ্‌যোজনের (mobilization) পদ্ধতির থেকে উৎসারিত হয়না, বরং হয় এটি যে মূল বৈপরীত্যের সমাধান করতে চাইছে তার প্রকৃতি থেকে, এর সামাজিক ও রাজনৈতিক অভীষ্ট থেকে, জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে সামিল করা ও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা থেকে, বিরাজমান প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করার এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রশ্নটিকে তুলে ধরার ক্ষমতা থেকে, সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এমন অঞ্চল ও সামাজিক শ্রেণীর উপর, তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর এবং ক্ষমতাভিত্তিক ও শোষণমূলক সম্পর্কগুলির উপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থেকে।"[৮১]

একবার যদি কংগ্রেস সমরপরিকল্পনার মূল চরিত্র ও লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম হয়, একবার যদি জাতীয় আন্দোলনের উভয় পর্যায়ের, অর্থাৎ স্থানপরিবর্তনের লড়াই এবং অবস্থানের লড়াইয়ের দ্বিবিধ দায়িত্বটি—ভারতীয়দের হৃদয়-মন জয় করা, এবং তাদের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী তথা তাদের নিজস্ব

ইতিহাসের স্রষ্টা করে তোলা—উপলব্ধি করা যায়, তাহলে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনের এবং বিশেষত এর বৈধতা-অতিরিক্ত গণ-আন্দোলনগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতার নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের তুলনায় প্রভুত্ববাদী সংগ্রামে সাফল্য ও পরাজয়ের প্রত্যয়-গুলি সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় জনগণ ও স্বীয় আমলাতন্ত্রের উপর ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব কতখানি হ্রাস পেল, জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার কতখানি প্রসার হল, তারা সংগ্রামের জন্য কতটা প্রস্তুত হল এবং তাদের সংগ্রামক্ষমতা কতটা বৃদ্ধি পেল, এসবই হল এক্ষেত্রে সাফল্য বা ব্যর্থতার মাপকাঠি। এই আলোকে বিচার করলে আমরা দেখব যে এই অভীষ্টগুলি ক্রমে ক্রমে অর্জিত হয়েছিল। গণআন্দোলনগুলি যখন অব-দমিত (১৯৩২, ১৯৪২), প্রত্যাহৃত (১৯২২), অবহেলিত (১৯৪০-৪১), অথবা আপোসের মধ্যে দিয়ে শেষ (১৯৩০-৩১, কিন্তু গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ) হয়েছিল, এবং অতএব তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের, অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের, নিরিখে আপাতভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সময়েও সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির পর্বগুলির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পরের পর গণআন্দোলনের জোয়ার এটা সম্ভব করেছিল। প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠার বিচারে এই আন্দোলনগুলি বিরাট সাফল্য ছিল এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনায় এক বিশাল অগ্রগতিকে সূচিত করেছিল।[৮২] এই আন্দোলনগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে চূর্ণ করা হয়েছিল, কারণ স্বল্পকালের জন্য হলেও জনগণ তীব্রতর শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা পদানত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল; তাদের সংগ্রামেচ্ছা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, ক্ষীণ হয়ে এসেছিল ব্রিটিশ শাসন ও তার অজেয়তা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস। ১৯৩৪-এ এবং পরে আবার ১৯৪৫-এ বন্দীদের মুক্তি উপলক্ষে যে বীরোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তা আইন অমান্যের প্রকৃত ফলাফল বা প্রকৃত প্রভাবকে প্রতীকায়িত করেছিল। ১৯৩০-এর সংগ্রামের ফলাফলের মূল্যায়ন করে লেবারপন্থী সাংবাদিক এইচ. এন. ব্রেইলস্-ফোর্ড লিখেছিলেন: ভারতীয়রা "নিজেদের মনকে মুক্ত করেছে, তারা নিজেদের হৃদয়ের ভিতর স্বাধীনতা লাভ করেছে··· লক্ষ লক্ষ লোক যারা কারাবরণ করেছিল এবং পুলিশের লাঠিচালনার মুখোমুখি হয়েছিল তাদের মানসিকতায় একটি স্থায়ী পরিবর্তন এসেছে। হাজার হাজার লজ্জাশীলা মহিলা ও অন্তঃপুরিকাদের দ্বারা লবণ প্রস্তুত করা অথবা কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা যে প্রতীকী বিদ্রোহকে সূচিত করেছিল, তাইই ছিল যথেষ্ট। এই সমস্ত কাজকর্মের মাধ্যমে তারা তাদের জড়াবস্থাকে (paralysis) ভেঙেছিলেন, ভেঙেছিলেন পূর্বনির্দিষ্ট নিকৃষ্ট-তার চৈতন্য।"[৮৩]

সমসাময়িক সমস্ত ব্যক্তির কাছেই যে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট ছিল না তা

ভাইসরয় উইলিংডনের দুটি মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯৩৩-এর গোড়ায় তিনি ঘোষণা করেন : "১৯৩০-এর তুলনায় কংগ্রেস নিশ্চিত-ভাবেই কম সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে এবং জনসাধারণের উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।"[৮৪] ১৯৩৪-এ কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন যখন কংগ্রেসের জয় এনে দেয় তখন তিনি বিলাপ করেন : "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এটি ক্ষুদে গান্ধীর একটি বিরাট জয়।"[৮৫] ১৯৩২-৩৪-এর আন্দোলনের আপাতদমন ও পরাজয় এবং আধিপত্যের প্রসারের প্রেক্ষিতে এর প্রকৃত সাফল্যের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ তিনি দেখেননি। তিনি একেবারেই জানতেন-না যে 'ক্ষুদে গান্ধীর বিরাট জয়' সংগ্রামের পরিকল্পনার সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল; বস্তুত ঠিক এই ফল অর্জনের জন্যই রচিত হয়েছিল এই পরিকল্পনা। প্রভুত্ববাদী সংগ্রামের আদ্যন্ত ব্যাপার ছিল এইটিই।

অন্যদিকে আধিপত্যের নিরিখে 'পরাজিত' আন্দোলনগুলির প্রকৃত কার্যকারিতা ও চরিত্র এবং ফলাফল সম্পর্কে গান্ধী ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন। নেহরুর হতাশাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা উপশম করে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লেখেন : "আমার মধ্যে কোনও পরাজয়ের অনুভূতি নেই, বরং আমাদের এই দেশ যে তার লক্ষ্যের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, এই আশা আমার মধ্যে ১৯২০-তে যেমন, এখনও তেমনই ভাস্বর।"[৮৬]

সূত্র-নির্দেশ

১. গান্ধী যে তাঁর সমরপরিকল্পনার স্থান ও কালগত নির্দিষ্টতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তা বোঝা যায় ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরের শেষ দিনটিতে একটি চীনা প্রতিনিধিবর্গের প্রতি তাঁর উক্তি থেকে : "যদি চীনাদের সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারতাম যে অহিংস পদ্ধতির মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে, তাহলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু আমার মত একজন লোক, যে লড়াইয়ের বাইরে রয়েছে, তার একটি জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত জনগণকে 'এভাবে নয়, ঐভাবে' বলার কোন অধিকার নেই। নতুন পদ্ধতিটি গ্রহণের জন্য তারা প্রস্তুত থাকবে না, আর পুরোনো পদ্ধতিতে তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। আমার হস্তক্ষেপ শুধু তাদের নাড়া দেবে, তাদের মনের দ্বিধার উদ্রেক করবে।" *Collected Works*, Vol. 68, p. 262.

২, তদেব, Vol. 69, p. 60.

৩. উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩০-এ খেড়ার করবিরোধী আন্দোলনে (no tax campaign) বা ১৯২৮-এ বারদোলি সত্যাগ্রহে কৃষকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সময় পুলিশ সন্ধ্যার পর বাড়িতে ঢুকত না বা তালাবন্ধ বাড়ির দরজা ভাঙত না ; গ্রামের জনগণ রাজকর্মচারীদের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে প্রত্যাখ্যান করলেও কর্মচারীরা তা ক্রোক

বা বাজেয়াপ্ত করত না। এই উদাহরণটির সঙ্গে তুলনা করুন H. V. R. Iyenger, I. C. S., *Oral History Transcript*, NMML.

৪. আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি ক্ষুদ্রতর উপনিবেশে এ ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতি ছিল যথেষ্ট আলাদা।

৫. এত বেশিসংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে প্রত্যেকের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আই. সি. এস. দের মধ্যে এস. আর, কাইওয়াড় (মাদ্রাজ, ২-৬-৮৪) এবং আর. এ. গোপালস্বামী (মাদ্রাজ, ৫-৬-৮৪) এই দিকটির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন।

৬. *Collected Works*, Vol. 66, p. 104.

৭. তদেব, Vol. 67, p. 39.

৮. তদেব, p. 52.

৯. তদেব, p. 226.

১০. তদেব, Vol. 66, pp. 391-2, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে হরিপুরা প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : "দেশীয় রাজ্যগুলি এবং অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে পরিস্থিতির পার্থক্যের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সাধারণ নীতি অনেক সময়েই রাজ্যগুলির পক্ষে অনুপযুক্ত…" In *Tendulkar*, প্রাগুক্ত, Vol. 4, p. 223.

১১. *Collected Works*, Vol. 76, যথাক্রমে pp. 439 ও 400.

১২. বহু বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই শিক্ষা দিয়ে আসছিল যে রাজনীতি সরলহৃদয়, শৈশব-অনতিক্রান্ত ভারতবাসীর বৈধ অঙ্গন নয়, বরং এটি একটি বিদেশী গাছ যাকে স্বীয় জনগণের থেকে উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্ন চাকুরীলোভী বাবুরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে (হটহাউসের ধরণে) ভারতবাসীর জীবনে রোপণ করছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই শাসকেরা যখন সৈয়দ আহমদ খান এবং অন্যান্যদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খাড়া করে, তখন একই সঙ্গে তারা তাঁকে ও তাঁর অনুগামীদের যে কোনও ধরনের রাজনীতি—এমনকি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও—পরিহার করে চলতে প্ররোচিত করে। এই নীতি পরিত্যক্ত হয় ১৯০৭-এ, যখন এর পক্ষে আর অস্তিত্বরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। মুসলিম অভিজাতবর্গ ও জায়গীরদারদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অনুসরণ করতে দেওয়া হয়েছিল, যদিও এছিল উচ্চশ্রেণীর রাজনীতি এবং এর চরিত্র ছিল রাজানুগত ও বিক্ষোভ-অনির্ভর (non-agitational)।

১৩. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, Gandhi, *Collected Works*, Vol. 69, p. 12 : সত্যাগ্রহের "ফলাফল নির্ভর করে সুস্থ জনমতের প্রকাশের উপর।" এছাড়াও দেখুন, Tendulkar, প্রাগুক্ত, Vol. 5, p. 23.

১৪. এই শব্দবন্ধটি ডি. কে. কুন্তের। সাক্ষাৎকার, পুণা, ৬-৬-১৯৮৫।

১৫. *Collecte1 Works*, Vol. 64, p. 319.

১৬. তদেব, Vol, 64, p. 194.

১৭. উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৩-এর ১৪ সেপ্টেম্বর নেহরুকে লেখা গান্ধীর চিঠি : "বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে গোপন পদ্ধতির প্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। যে জনসাধারণকে

আমরা নির্ভীকতার শিক্ষা দিতে চাই তাদের জন্য আমি এই সুবিধাটি ছেড়ে দিতে রাজী আছি···গোপনতা হল আইন অমান্যের মেজাজের বিকাশের পরিপন্থী।" *Collected Works*, Vol. 55, p. 429. ১৯৩০ এবং ১৯৩২-৩৪-এর আন্দোলনের সময় কর্মীদের গ্রেফ্তারের জন্য হাজির না হওয়ার অর্থে গুপ্ত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের কারোর কাছেই মিথ্যা নাম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি, এমনকি সামনে এসে পড়া পুলিশের কাছেও নয়। খদ্দরের পোশাক—যা ছিল স্বাধীনতার উর্দি', কিন্তু একই সঙ্গে খোলাখুলি সনাক্তকরণের সহায়ক—পরা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতিও তাদের ছিলনা। এই বক্তব্য আমাদের সাক্ষাৎকারগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৮. স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতি কংগ্রেসকে কলঙ্কিত করছে, এই অনুভূতি ১৯৩৯-এর গোড়ায় গান্ধীকে নৈরাশ্যাক্রান্ত করেছিল। এইজন্যই সুভাষ বসু ও বামপন্থী গোষ্ঠীর মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন যে আরেক দফা অবৈধ গণসংগ্রামের জন্য দেশ তখনও প্রস্তুত নয়। দ্র. Gyanesh Kudaisya, *Office Acceptance and the Congress 1937-1939 Premises and Perceptions*, Chapter 7, M. Phil. dissertation.

১৯. যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা কার্যপ্রণালী গান্ধী-আরউইন চুক্তির জন্য দায়ী ছিল ভারত সরকার যে সেটি বদলাতে চেয়েছিল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে কঠিনতর নীতি গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তার একটি কারণ ছিল নিজের কর্মচারী, বিশেষত গ্রামীন কর্মচারী ও পুলিশের উপর প্রভুত্ব হারানোর ভয়। দ্র. R. J. Moore, *The Crisis of Indian Unity*. p, 289.

২০. ১৯৪২-এ একজন ব্রিটিশ পুলিশ কর্মচারীর উপর এই নীতির প্রভাব সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন সরলা দেবী মজুমদার (বোম্বাই, ২৯-৫-১৯৮৫)।

২১. *Collected Works*, Vol. 66, p. 104.

২২. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, M. Hallett-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপর টীকা, ২২ এপ্রিল ১৯৪১, Linlithgow Papers, F. 125/104.

২৩. অচ্যুত পটুবর্ধন আমাদের বলেন (বাঙ্গালোর, ৭-১২-১৯৮৪) যে বোম্বাইয়ে ১৯৪২-এর আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তিন সদস্যের যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দলটির উপর ন্যস্ত হয়েছিল, তার একজন জাতীয়তাবাদীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৪২-এর আন্দোলন সম্পর্কে যে বহু লোক একই কথা বলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন লতা পরাইয়া (বোম্বাই, ২১-৫-৮৫), বসন্তদাদা পাটিল (বোম্বাই, ১৪-৬-১৯৮৫), অনাবথুক্কল অচুথন (কাসারগোদ, কেরালা, ১৩-৫-১৯৮৪)।

২৪. ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম পর্যায়ে ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোর বিশৃঙ্খলা, এবং ভারতত্যাগের সিদ্ধান্তের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে একটি আলোচনার জন্য দেখুন, Sucheta Mahajan, 'British Policy and the Popular National Upsurge, 1945-46', in A. K. Gupta, ed , *Myth and Reality—Struggle for Freedom 1945-47*.

২৫. ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে আমি এই সমর পরিকল্পনাকে চাপ-আপোস-চাপ (Pressure-Compromise-Pressure বা P-C-P) বলে বর্ণনা করেছি। সেই সময় আমি প্রচলিত মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা সবে শুরু করেছিলাম, এবং সেজন্য এর জটাজাল থেকে তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারিনি। আশা করি আমার সতীর্থদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা আমার বোধকে সমৃদ্ধ করেছে, যদিও এই বোধ এখনও পরিণতির পথে।

২৬. সাক্ষাৎকার, পিপলাও, খেড়া, গুজরাট, ৩-৭-১৯৮৫।

২৭. নেহরু এও বলেছিলেন যে হয় সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা টিকে থাকবে অথবা ভারতীয়রা "দুর্গের দখল" নেবে। *Selected Works*, Vol. 6, p. 104.

২৮. আমরা বলতে পারি যে ১৯২০-র দশকে ইওরোপে সমাজগণতন্ত্রী দলগুলির বৃহত্তম ভুল ছিল এটাই, সরকার গঠন করা বা সংসদে যোগদান করা নয়।

২৯. ১৯৩৫-৩৬-এ গান্ধী যে নেহরুকে কংগ্রেসের অগ্রণীনেতার স্তরে উন্নীত করেছিলেন, তার একটি কারণ ছিল যত শীঘ্র সম্ভব গণআন্দোলন শুরু করার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা।

৩০. *Collected Works*, Vol. 67, p. 226.

৩১. তদেব, Vol. 69, pp. 78-৯.

৩২. *AICC News Letter*, Letter No. 31, 14 November 1935. রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর বারো বছর যে তুলনামূলকভাবে শান্তি বিরাজ করেছিল, সে ব্যাপারটির প্রতি ডি. কে. কুন্তে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাক্ষাৎকার, পুনা ৬-৬-১৯৮৫।

৩৩. J. B. Kripalani, Speech at Lucknow Congress, in A. M. & S. G. Zaidi, eds., *The Encyclopaedia of Indian National Congress*, Vol. 11, p. 48.

৩৪. K. M. Munshi, 'Office Acceptance: A Survey of the Problem' Pamphlet, *Rajendra Prasad Papers*, File No. 1/36, Collection 6.

৩৫. বামপন্থীরা বিশ্বাস করতেন যে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত না হওয়া অবধি তার সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনকে একটি স্থায়ী এবং বৈধতা-অতিরিক্ত গণসংগ্রাম চালাতে হবে। আন্দোলনে প্রতিকূলতা আসবে, আসবে উত্থান ও পতনের পর্যায়, কিন্তু এগুলি সে ধরণের নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দেবে না যেখানে সামনাসামনি লড়াই থেকে সরে আসা হবে, কিছু কিছু ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হবে, উদ্যমকে সরিয়ে আনা হবে অরাজনৈতিক এবং অশ্রেণীভিত্তিক গঠনমূলক কর্মসূচীর দিকে। নেহরুর ভাষায়, কংগ্রেসকে "একটি আক্রমণাত্মক প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার নীতি" বজায় রাখতেই হবে। জাতীয়তাবাদী গণসংগ্রামকে চিরস্থায়ী হতে হবে, এবং তা শুধুমাত্র অসাংবিধানিক ও অবৈধ উপায়েই অগ্রসর হতে পারবে। একবার জনসাধারণ প্রবেশ করে আন্দোলনের রাশ নিজের হাতে নিয়ে নিলে আর মাঝ রাস্তায় থেমে যাওয়ার উপায় থাকেনা।

৩৬. মাধবলাল শংকরলাল যেমন বলেছিলেন (সাক্ষাৎকার, পিপলাও, খেড়া, গুজরাট, ৩-৭-১৯৮৫), জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার এগিয়ে যায়।

তিনি আরও বলেছিলেন যে তারা খুব বেশি দমন সহ্য করতে পারেনা। একই কথা বলেছিলেন ডি. কে. কুন্তেও (সাক্ষাৎকার, পুনা, ৬-৬-১৯৮৫)। তিনি স্মরণ করেছিলেন সেই ঘটনার কথা যা জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম চালানোর অক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করেছিল। অন্য অনেক অল্পবয়েসী মানুষের মত তিনিও ১৯৩১-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরেই আন্দোলনের প্রত্যাহারের ব্যাপারটি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে যাওয়ার পথে তিনি একটি জনসভায় ভাষণ দেন এবং বক্তৃতার মধ্যেই আন্দোলন প্রত্যাহারের কারণে তাঁর হতাশাকে ব্যক্ত করেন। তিনি বসার পর কৃষকের পোশাক পরা একটি লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আসে। কুন্তের উদ্দেশে সে প্রশ্ন করে: "আপনি কি বিবাহিত?" কুন্তে জবাব দেন, "না।" "আপনার বাবাই কি আপনার ভরণপোষণ করেন?" "হ্যাঁ।" 'সেই-জন্যই আপনি আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য এত ব্যাকুল। আপনার যদি নিজের পরিবার থাকত এবং তাদের খাওয়াতে হত, তাহলে আপনি অনেক অন্য সুরে কথা বলতেন।" ১৯৩১ সালে বিহার সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাশরণ সিংহ (সাক্ষাৎকার, নয়াদিল্লী, ১৫-১২-১৯৮৫) এবং আরও অনেকে তাঁদের সাক্ষাৎকারে একই মত পোষণ করেছেন।

৩৭. এই বাক্যবন্ধটি ডি. কে. কুন্তের। সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত।

৩৮. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ডি. কে. কুন্তে সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত। ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, উভয় শ্রেণীর গেরিলা সংগ্রামীদের অধিকাংশই এ বিষয়ে খুব পরিষ্কার ছিলেন যে তাঁরা গণআন্দোলনের বিকল্প নন। তাঁদের বিচারে গুপ্ত কার্যকলাপের প্রধান কাজ ছিল জনগণের মনোবলকে জীইয়ে রাখা (উদাহরণস্বরূপ দেখুন, অচ্যুত পটবর্ধন, প্রাগুক্ত)। কেউ কেউ অবশ্য পরে দাবি করেন যে গুপ্ত কার্যকলাপের সহজতর পথটিতে প্রবেশ করাই ভুল হয়েছিল; এর বদলে চেষ্টা করা উচিত ছিল একটি গণআন্দোলন গড়ে তোলার, সে আন্দোলন তৎকালীন প্রেক্ষিতে যতই কঠিন ও সীমাবদ্ধ হোকনা কেন। উদাহরণের জন্য দেখুন, লালভাই দহিয়াভাই নায়েক, সাক্ষাৎকার, নৌসারি, গুজরাট, ২৭-৬-১৯৮৫।

৩৯. *Collected Works*, Vol, 61, p. 439.

৪০, তদেব, Vol. 58, p. 318.

৪১. *An Autobiography*, pp. 364-6.

৪২. *Collected Wokrs*, Vol. 67, p. 195.

৪৩. তদেব, p. 420 এবং Vol. 69, p. 60.

৪৪. ১৯৪৫-এর ২২ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস নীতি সম্বন্ধে গৃহীত AICC প্রস্তাবে বলা হয়: "সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পরিবর্তিত অসহযোগের পদ্ধতিকে কংগ্রেস যেমন ছাড়তে পারেনা, তেমনই আলাপ-আলোচনা ও সন্তোষবিধানের পদ্ধতিকেও—যা হল শান্তি-পূর্ণ নীতির মোদ্দা কথা—সে কখনোই বর্জন করতে পারেনা, প্রলোভন যতই তীব্র হোকনা কেন। সুতরাং কংগ্রেসের নির্দেশক সূত্র সবসময়েই থাকা উচিত: সম্ভবমত আলাপ-আলোচনা ও আপোস-মীমাংসা, প্রয়োজনানুসারে অসহযোগ এবং প্রত্যক্ষ

পদক্ষেপ (direct action)।" *Indian National Congress, March 1940 to September 1946 : Being the Resolutions Passed by the Congress, the AICC and the Working Committee,* AICC-র সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩৯-এ গান্ধী এই ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন: "সর্বদা একজন সত্যাগ্রহীর প্রথম ও শেষ কাজ হবে একটি সম্মানজনক পথের অনুসন্ধান করা ···আমাদের লক্ষ্য যা আছে তাই থাকবে, কিন্তু প্রার্থিত গোটা জিনিসটির তুলনায় কম প্রাপ্তির জন্যও আমাদের আলাপ-আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যদি অবশ্য এই জিনিসটি নির্ভুলভাবে একই প্রকৃতির হয় এবং এর মধ্যে ব্যাপ্তির অন্তর্গত সম্ভাবনা থাকে।" *Collected Works* Vol. 69, p. 323. ১৯৪৬-এর ২৬ নভেম্বর মীরাটে তাঁর সভাপতির ভাষণে কৃপালনীও এই ব্যাপারটির উপর জোর দিয়েছিলেন : "একজন সত্যাগ্রহী যখন শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধানের সুযোগ দেখে তখন সে চট করে লড়াইয়ের পথে যায়না, মিটমাট করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তার মূল দাবিগুলি যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে টেবিলে বসে আলাপ-আলোচনা করতে রাজী থাকে।" *Presidential Address, Indian National Congress, Fifty Fourth Session.*

৪৫. *Collected Works,* Vol. 61, pp. 88-9.

৪৬. Tendulkar, প্রাগুক্ত, Vol. 4, p, 44.

৪৭. *Collected Works,* Vol. 55, p. 429. এমন অনেকেই ছিল যারা নানাবিধ কারণে জেলে যেতে পারেনি এবং গঠনমূলক কাজকর্মে যোগ দিয়েছিল। অল্প বয়সে বিধবা-হওয়া নির্মলা শ্রফ তিরিশের দশকে খাদির কাজকর্ম শুরু করে এবং এমনকি আজকেও বোম্বাইয়ের নানা চৌকে খাদি ভাণ্ডারটি চালাচ্ছেন। সাক্ষাৎকার, বোম্বাই, ৯-৬-১৯৮৫। মণিবেন নানাবতী তাঁর দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ভিলে পার্লের বাড়িতে বাড়িতে খাদি বিক্রি করতেন, এবং আজ পঁচাত্তর বছর বয়সেও ফ্লোরা ফাউণ্টেন খাদি ভাণ্ডারে প্রত্যেকদিন যান। মণিবেন নানাবতী ও তাঁর মেয়ে অরুণা পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বোম্বাই, ২৮-৫-১৯৮৫। সুপরিচিত কম্যুনিস্ট নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডি ছাত্রাবস্থায় লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে কাকিনাড়া চলে যান। তাঁর পরিবারের লোকজন সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করে তাঁকে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে নিরস্ত হতে এবং নিজের গ্রামে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। তিনি এই শর্তে রাজী হন যে তাঁর পরিবার একটি খাদি-উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যয়ভার বহন করবে। এই কাজ তিনি এক বছর ধরে চালান। সাক্ষাৎকার, হায়দরাবাদ, ৮-৭-১৯৮৪।

৪৮. আমরা যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের একটা বড় অংশের জীবনেতিহাসের ছকটি এইরকমই। উদাহরণের জন্য, অনাবথুক্কল অচুথনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কাসারগোদ, কেরালা, ১৩-৫-১৯৮৪।

৪৯. আমাদের সাক্ষাৎকারগুলি নেবার সময় আমরা আবিষ্কার করি যে হরিজনদের জাতীয় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণ না-করার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল তাদের চূড়ান্ত আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাদপসরতা। আবার দেশের অধি-

কাংশ জায়গায়—স্বাধীনতার আগে এবং পরেও, অর্থাৎ ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত—তারা যে বামপন্থী রাজনীতিতে প্রবেশ করেনি, তারও এটি ছিল অন্যতম কারণ। উদাহরণস্বরূপ, কে. সুব্রহ্মণ্যম 'সুরি' (মাদ্রাজ, ৭-৬-১৯৮৫) এবং হরিজন অংশগ্রহণকারী মাল্লেলা কুরুপানন্দমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (নিদুব্রোলু, গুন্টুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ২২-৬-১৯৮৪)।

৫০. আমরা যে হরিজন ও নিম্নবর্ণের অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁরা এই দিকটির উপর জোর দেন ; উদাহরণস্বরূপ, মাল্লেলা কুরুপানন্দম্, নিদুব্রোলু, গুন্টুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ২২-৬-১৯৮৪, অপ্পিকাতলা জোসেফ, বিজয়ওয়াড়া ২৯-৬-১৯৮৪, কোনড় সূর্যপ্রকাশ রাও, বিজয়ওয়াড়া, ২৬-৬-১৯৮৪ এবং অনাবথুরুল অচুথন, কাসারগোদ, মালাবার, ১৩-৫-১৯৮৪।

৫১. সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রক্ষমতার অংশবিশেষের হস্তান্তরের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের এই দাবি যে ঠিক নয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৩৫ এর আইনের উপর সংযুক্ত সংসদীয় সমিতির (Joint Parliamentary Committee) চেয়ারম্যান লর্ড লিনলিথগোর কথা থেকে। তিনি পরে বলেছিলেন যে এই আইনটি রচিত হয়েছিল ' কারণ আমরা ভেবেছিলাম যে ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব বজায় রাখার...এটিই সর্বোত্তম উপায়। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতে সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলিকে ত্বরান্বিত করা আমাদের নীতির অংশ নয়। দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ভারতকে সাম্রাজ্যভুক্ত করে রাখতে হলে ঠিক যা দরকার, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে তার থেকে দ্রুতগতিতে ভারতীয়দের হাতে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়াও এর উদ্দেশ্য নয়।" উদ্ধৃতিসূত্র : R. J. Moore, "The Problem of Freedom with Unity : London's India Policy, 1917-47", in D. A. Low, ed., *Congress and the Raj*, p. 379.

৫২ "একমাত্র চূড়ান্ত রাস্তা হল কংগ্রেসের বিভাজন এবং সম্পত্তির অধিকারের রক্ষণার্থে দক্ষিণপন্থীদের বাইরের নরমপন্থী চিন্তাগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগদান।" Linlithgow to Haig, 23 October 1938, *Haig Papers*, Roll 1, NMML.

৫৩. ১৯৩৭-এর ৫ মার্চ লিনলিথগো সেক্রেটারি অব্ স্টেট জেটল্যান্ডকে লেখেন : "আসল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার আগে কংগ্রেসের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং যদি তারা নিজেদের ঝামেলা নিজেরাই মিটিয়ে নেয়, তাহলে অবশ্য খুবই সুবিধে হয়।" *Linlithgow Papers*, F. 125/4, NMML.

৫৪. সরকারী কর্মচারীরা ভেবেছিলেন যে নেহরু ও তাঁর অনুগামীরা র‍্যাডিকাল চিন্তাভাবনা এবং ১৯৩৫-এর সাংবিধানিক সংস্কারগুলির বাস্তবায়নের বিরোধিতার পথে এতদূর এগিয়ে গেছেন, যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (AICC) ও লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর হাতে পরাজয়ের পর তাঁরা বোধহয় পিছু হটবেন না, বরং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবেন। এইজন্যই ১৯৩৫-৩৬ এ প্রায় সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী নেহরুকে গ্রেফতার না করার জন্য ভাইসরয়কে পরামর্শ দেন। যেমন, মাদ্রাজের

গভর্নর আরস্কিন পরামর্শ দেন ঃ "এই ধরণের বক্তৃতা নেহরু যত দেবেন ততই ভালো, কারণ তাঁর মনোভাব নিশ্চিতভাবেই কংগ্রেসের বিভাজনকে সাহায্য করবে। বস্তুত, আমাদের উচিত তাঁকে প্রশ্রয় ও মদত দিয়ে যাওয়া, কারণ তিনি তাঁর অজান্তে ভিতর থেকে কংগ্রেস সংঘঠনটিকে ভাঙছেন। Erskine to Craik, April 20, 1936, *Home Political Proceedings*, F. No. 4/6/36,

৫৫. যেরকম লিনলিথগো ১৯৩৬-এ লিখেছিলেন, "প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিপ্লবের একটি সর্বভারতীয় অস্ত্র হিসাবে কংগ্রেসের কার্যকারিতাকে নষ্ট করার যে শক্তি রাখে, তার মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সুযোগ।" in John Glendevon, *The Viceroy at Bay*, p. 52.

৫৬. তিনি ১৯২৬-এ লেখেন ঃ "কাউন্সিল-প্রবেশের ব্যাপারটি আমি মন থেকে মেনে নিতে পারছিনা। যত সময় যাচ্ছে ততই এই বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হচ্ছে যে কাউন্সিল-প্রবেশই আমাদের কিছু কিছু সমস্যার উৎস।" *Collected Works*, Vol. 30, p. 395.

৫৭. "আমার ব্যক্তিগত মত ছিল পদ-গ্রহণের বিরুদ্ধে। সুতরাং আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment) সম্পর্কে আমার মত দিতে চাই, যখন গত কয়েকমাস ধরে এটি চালু রয়েছে। আমার মতে, পদ-গ্রহণের দ্বারা আমরা উপকৃতই হয়েছি। এক নতুন প্রাণচঞ্চলতা, এক নতুন স্বপ্ন দেশকে স্পন্দিত করছে। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করি, সুতরাং এই নতুন পরীক্ষার ফলে কৃষক, শ্রমিক ও বণিকেরা কি ভাবছে তা দেখার এবং অনুভব করার যথেষ্ট সুযোগ পাই। যেখানেই কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে।" AICC-র কলকাতা অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, 29 October 1937, S Gopal, ed., *Selected Works*, Vol. 8, p. 338. ৫ নভেম্বর ১৯৩৭-এ এলাহাবাদে একটি ভাষণে তিনি এর পুনরাবৃত্তি করেন : "পদ-গ্রহণের মহত্তম ফলাফল হল জনমানস এবং দেশের বাতাবরণে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলিকে কোনও দাঁড়িপাল্লা দিয়েই সঠিকভাবে ওজন করা যায়না। সাহস, দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতিগুলি হল সেই ধরনের জিনিস। একটি বিরাট সুবিধে রয়েছে এই, যে জনসাধারণের মাথার উপর থেকে বোঝা কিছুটা কমেছে] কৃষক ও শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে কিছু সাহায্য। পদ-গ্রহণের সিদ্ধান্তের অনুকূলে এটি ছিল একটি বিরাট যুক্তি। তদেব, pp. 350-1.

৫৮. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, গান্ধীর অগস্ট ১৯৩৮-এর বক্তব্য ঃ "কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে এই আইনের প্রণেতাদের প্রত্যাশানুযায়ী এই আইনকে ব্যবহার করতে নয়, ভারতবাসীদের নিজেদের প্রণীত একটি প্রকৃত আইনের দ্বারা এর প্রতিস্থাপনের দিনটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য।" *Collected Works*, Vol. 67, p. 226

৫৯. নেহরুকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫, in Jawaharlal Nehru, *A Bunch of Old Letters*, pp. 156-7,

৬০. A. M. and S. G. Zaidi, editors, *The Encyclopaedia of the Indian National Congress*, Vol. II, pp. 41-2.

৬১. আমাদের সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলির কাজকর্মের এই দিকটির উপর জোর দিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন সি. সুব্রহ্মনিয়ম, মাদ্রাজ, ২-৬-১৯৮৪, মোরারজী দেশাই, বোম্বাই, ১৪-৬-১৯৮৫, এম. ভক্তবৎসলম্, মাদ্রাজ, ৪-৬-১৯৮৪, নাগেশ্বর রাও, কাওয়ালি, অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৭-৬-১৯৮৪, ই. পি. গোপালন, কোম্পম্, পটম্বী, পালঘাট, কেরালা, ১৮-৫-১৯৮৪ এন. কৃষ্ণ নায়ার, কালিকট, কেরালা, ১২-৫-১৯৮৪, এ. ভি. শ্রীকণ্ঠ পদ্মভল, অন্নুর (তালিপরম্বা), কেরালা, ১৫-৫-১৯৮৪। এই কারণে এবং সহযোজনের সম্ভাবনা খুব কম থাকার দরুণ গান্ধী-বাদী ও র‍্যাডিক্যালরা পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করতে কোনও দ্বিধা করেন নি।

৬২. এই একই সাফল্য বিরাটাকারে পাওয়া গিয়েছিল যখন সরকার ১৯৩১ সালে গান্ধীর সঙ্গে সমপদস্থতার ভিত্তিতে একটি চুক্তি সাক্ষর করে।

৬৩. অনেক বামপন্থী সক্রিয় কর্মী কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলির এই দিকটির উপর ঝোঁক দেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার: কে. মুরুগেসন, এক কম্যুনিস্ট ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা, মাদ্রাজ, ৯-৬-১৯৮৪, সি, পি. আই. নেতা অচ্যুত মেনন, ত্রিচুর, ২১-৫-১৯৮৪, ভি. প্রসাদ রাও, অন্ধ্রের কম্যুনিস্ট নেতা. নয়াদিল্লী, ১৭-৩-১৯৮৫, এম. কুমারন, এক কম্যুনিস্ট নেতা, বাদগারা, কালিকট, কেরালা, ১১-৫-১৯৮৪। এছাড়াও দেখুন, Visalakshi Menon, "National Movement. Congress Ministries and Imperial Policy : UP 1937-1939", M. Phil dissertation.

৬৪. কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের নির্বাচনে (Central Legislative Assembly) যাঁরা লড়তে চেয়েছিলেন তাঁদের সমর্থন করে গান্ধী ১৯৩৪-এ লেখেন: "আশা করি কাউন্সিলের কাজকর্মের চাকচিক্য অধিকাংশ লোককেই স্পর্শ করতে পারবেনা। এমনিতে, এই ধরনের কাজের দরকার আছে। কিন্তু কংগ্রেস যদি শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মেই মনোনিবেশ করে তবে সেটা হবে তার পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। স্বরাজ ঐ পথে কথনোই আসবেনা। স্বরাজ একমাত্র আসতে পারে জনগণের সার্বিক চেতনার মাধ্যমেই।' *Collected Works*, Vol. 58. p. 11.

৬৫. ওয়াই. বি. চহ্বনের ভাষায়, "সাংবিধানিক লড়াই ছিল লড়াইয়ের আর একটি ধরন, যদিও প্রকৃত ভিত্তি ছিল গণসংগ্রাম।" সাক্ষাৎকার, নয়াদিল্লী, ২-৫-১৯৮৪।

৬৬. Visalakshi Menon, প্রাগুক্ত।

৬৭. দ্র. 'Elements of Continuity and Change in the Early Nationalist Activity', in Bipan Chandra, *Nationalism and Colonialism in Modern India*.

৬৮. গান্ধী স্পষ্ট করে অনেকবারই বলেছিলেন যে তাঁর কাছে অহিংসা একটি আদর্শের ব্যাপার, একটি অবশ্যপালনীয় বিধি হলেও তিনি একে কার্যধারার (policy) ব্যাপার

হিসেবে যা বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্রহণ করার জন্যই জনসাধারণকে এবং জাতীয় আন্দোলনকে বলছেন।

৬৯. উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার: সি. সুব্রমনিয়ম, মাদ্রাজ, ২-৬-১৯৮৪, ডি. কে. কুনতে, প্রাগুক্ত, পি. কে. কুনতে, বোম্বাই, ২৪-৫-১৯৮৫, মাধবলাল শংকরলাল পাণ্ড্য, প্রাগুক্ত, লালভাই দহিয়াভাই নায়েক, প্রাগুক্ত, ভায়েদ পাশাভাই ভাইলালভাই আমিন, আনন্দ, গুজরাট, ৪-৭-১৯৮৫, ত্রিভুবনদাস পটেল, আনন্দ, গুজরাট, ১-৭-১৯৮৫।

৭০. উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার: এ. ভি. কুট্টিমালু আম্মা, এর্নাকুলম, ২৩-৫-১৯৮৪, মৃণালিনী দেশাই, বোম্বাই, ২২-৫-১৯৮৫, তুম্মালা দুর্গাম্বা, গুণ্টুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ২৩-৬-১৯৮৪, কস্তুরি তুলসীয়াম্মা, গুণ্টুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ২৩-৬-১৯৮৪। গান্ধীও লক্ষ্য করেন যে, "সত্যাগ্রহ এমন এক সংগ্রাম যাতে বয়োবৃদ্ধ এবং দুর্বলকায়রাও অংশ নিতে পারে, যদি তাদের হৃদয় শক্তিশালী হয়।" *Colleeted Works*, Vol. 68, p. 387.

৭১. দ্র. Sucheta Mahajan, প্রাগুক্ত।

৭২. শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যকারীরা পুলিশের হাতে প্রহৃত হচ্ছে, এই দৃশ্য অনেক নিষ্ক্রিয় দর্শককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করেছিল। এক সাক্ষাৎকারদাত্রী আমাদের বলেছেন ১৯৪২-এর আগস্টের উত্তাল দিনগুলিতে একদিন একটি ছোট মেয়ের জাতীয় পতাকা উঁচুতে ধরে একটি সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর দিকে বীরের মত এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি তাঁকে কিরকম প্রভাবিত করেছিল। তিনি তখন দৌড়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছোট মেয়েটির হাত থেকে পতাকাটি নিয়ে নেন, যাতে পুলিশ তাকে না মারে। এর ফলে হাতাহাতির সূত্রপাত হয় এবং তাঁকে জেলে যেতে হয়, যদিও তার পরে খুব তাড়াতাড়িই তিনি ছাড়া পান। যাই-হোক, এর ফলে একজন সহানুভূতিশীল দর্শক থেকে একজন সক্রিয় সংগঠকের ভূমিকায় তাঁর উত্তরণ ঘটে। ডি. আই. আর. অগ্রাহ্য করে তিনি একটি মিছিল বের করেন, ফলে ফের কারারুদ্ধ হন এবং এবার দোষী সাব্যস্ত হন। পরে তিনি গুজরাটের এক সুদূর গ্রামে হরিজনদের মধ্যে গঠনমূলক কাজকর্মে তাঁর সারা জীবন নিয়োজিত করেন। সরলা দেবী মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বোম্বাই, ২৯-৫-৮৫। এমন অনেক নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন কারণে কারাবরণ করতে বা আইন অমান্যকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। তাঁরা ছুটে গিয়েছিলেন নিকটতম খাদি ভাণ্ডারে, নিজেদের বিদেশী জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে পায়ে মাড়িয়েছিলেন এবং খাদি পরেছিলেন।

৭৩. এর উল্টোটাও অবশ্য সত্যি। একটি প্রভুত্বের লড়াইয়ে যাকে আপাতদৃষ্টিতে আন্দোলনের হিংসার পথে অকারণ মোড়-নেওয়া বলে মনে হয়, তাইই গণসমর্থন এবং নৈতিক শক্তিতে ঘুণ ধরিয়ে দেয়।

৭৪. আইন ও প্রশাসনের নীতি-নিয়মকানুনের উপর ঔপনিবেশিক সরকারের নির্ভর করার সুস্পষ্ট প্রবণতাটিকে সমসাময়িক অনেকে, এবং পরবর্তীকালের অনেক লেখকও

নিষ্ক্রিয়তা বলে ভুল করেছিলেন। বস্তুত, বিপদের মুখে কোনও রাষ্ট্রই নিষ্ক্রিয় থাকেনা ; সব সময় প্রশ্ন দাঁড়ায় ঠিক কখন তার প্রয়োজনানুসারে কঠিন হওয়ার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা হবে। ভারতের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের এই দুটিই ছিল।

৭৫. আমাদের সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে অ-কম্যুনিস্ট প্রায় সবাই এবং কম্যুনিস্টদের কয়েক-জন এই দুটি ধারণাই ব্যাপকভাবে পোষণ করেন।

৭৬. এইদিক থেকে বিচার করলে অহিংসার অর্থ ছিল সরকারকে আন্দোলনের উপর কঠিন আঘাত হানার নৈতিক সুযোগ না দেওয়া। এতে অবশ্য ধরে নেওয়া হয় যে হয় সরকার এধরনের একটি সুযোগ না আসা অবধি আঘাত করবেনা, নয়তো যদি সে তা করেও তাহলে তাকে প্রভুত্বের হিসেবে এক বিশাল মূল্য দিতে হবে।

৭৭. বেশ কয়েকজন সাক্ষাৎকারদাতা আমাদের বলেন যে তাঁদের অভিজ্ঞতায়, পুলিশ যখন একটি সহিংস আন্দোলনকে ধ্বংস করত তখন জনগণ ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ত, কিন্তু যখন অহিংস পিকেটাররা আক্রান্ত হত, তখন জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ত এবং কোনও না কোনও ভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করতে চাইত।

৭৮. টমাস গে, সাক্ষাৎকার, পুণা, ৯-৬-১৯৮৫। তালুক পর্যায়ের একজন নেতা, ভি. কে. কুন্তে আমাদের বলেন যে "আমাদের অহিংসার মাধ্যমে আমাদের তহশীলদার ও অন্যান্য নিচের সারির কর্মচারীদের বলেছিলাম যে আমরা তোমাদের শত্রু নই।" প্রাগুক্ত। উমাশঙ্কর যোশীও এই ব্যাপারটির উপরই জোর দেন। সাক্ষাৎকার, আহমেদাবাদ, ৭-৭-১৯৮৫।

৭৯. *Oral History Transcript*, NMML. আয়েঙ্গার তখন ছিলেন বোম্বাই সেক্রেটারি-য়েটের এক তরুণ আই. সি. এস অফিসার ; তিনি ১৯৪২-এ বোম্বাইয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব ১৯৪৮-এ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব, তারপর নেহরুর মুখ্য ব্যক্তিগত সচিব, এবং ১৯৫৭-র পর থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হিসাবে কাজ করেন।

৮০. "যখন গুরুতর প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেওয়া হয় তখন তা ন্যায়সঙ্গত : নীতি হিসাবে অহিংসা সমস্ত গণআন্দোলনের পক্ষেই অপরিহার্য।" Bhagat Singh, *Why I am an Atheist* (with an introduction by Bipan Chandra), pamphlet, Shaheed Bhagat Singh Research Committee, Delhi 1979. "আজকের যে কোনও মহান মুক্তি আন্দোলনকে অতি অবশ্যই গণআন্দোলন হতে হবে, এবং সংগঠিত বিদ্রোহের সময়গুলি ছাড়া গণআন্দোলনকে হতে হবে মূলগত ভাবে শান্তিপূর্ণ। আমরা এক দশক আগের অসহযোগ বা আধুনিক শিল্পশ্রমিকের অস্ত্র সাধারণ ধর্মঘট, যাকেই অবলম্বন করিনা কেন, মূলসূত্র হবে শান্তিপূর্ণ সংগঠন এবং শান্তিপূর্ণ কাজকর্ম।" *Selected Works of Jawaharlal Nehru*, Vol. 4, p. 195. অবশ্য রাষ্ট্র যেখানে গণআন্দোলনের কোনও সুযোগ দেয়না, সেখানে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ এবং সমাজ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনগুলির সশস্ত্র সংগ্রামের রণভূমিতে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই।

৮১. Mridula Mukherjee, "Peasant Resistance and Peasant Consciousness in Colonial India : A Historiographical Critique."

৮২. "একটি আন্দোলনেও আমরা জিতিনি, এবং তবু ১৯৪৭-এ ব্রিটিশরা চলে গিয়েছিল।" মোরারজী দেশাই, সাক্ষাৎকার, বোম্বাই, ১৪-৬-১৯৮৫।

৮৩. উদ্ধৃতি সূত্র : Bisheshwar Prasad, *Bondage and Freedom*, Vol. II, p. 423.

৮৪. উদ্ধৃতিসূত্র : B. R. Nanda, *Mahatma Gandhi, A Biography*, p. 339.

৮৫. উদ্ধৃতিসূত্র : D. A. Low, " 'Civil Martial Law' : The Government of India and the Civil Disobedience Movements, 1930-34", in D. A. Low, ed., *Congress and the Raj*, p. 190.

৮৬. *Collected Works*, Vol. 55, p. 430. আইন অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার করে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি যে বিবৃতিটি দিয়েছিল তাতে গণআন্দোলনের প্রভুত্ববাদী দিকটি সম্পর্কে তার সচেতনতা ফুটে ওঠে : "অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্য ছাড়া দেশব্যাপী এই অসাধারণ গণজাগরণ কখনোই সম্ভব হতনা।" *Tendulkar*, প্রাগুক্ত, Vol 3, p. 302.

৪

জনগণ ও নেতারা

একটি গণ আন্দোলন ও তার ইতিহাসকাররা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয় তা হ'ল জনগণ ও নেতাদের ভূমিকার মধ্যে, স্বতঃস্ফূর্ততা ও সংগঠনের (এবং উপর নির্দেশের) মধ্যে, গণচেতনা ও তার পরিবর্তনের মধ্যে একটি নির্ভুল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। নেতাদের কাজকর্মের ওপর মনযোগ দিয়ে, যা বহু গতানুগতিক জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ করেছেন, অথবা জনগণ ও তাদের নেতাদের মধ্যে একটি বিভাজন রেখা টেনে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে, যেরকম সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন, এর কোনভাবেই জাতীয় আন্দোলনকে অধ্যয়ণ করা সম্ভব নয়।

একটি আন্দোলনের, সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটা নেতৃত্ব থাকবেই কিন্তু তা গণ আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় কেবল জনগণ যখন তাতে যোগ দেয়। একটি গণ আন্দোলনকে জনগণের চাহিদা এবং গণ চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নেতৃত্ব ইচ্ছামতো একটা আন্দোলন তৈরী করে তারপর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বা বুঝিয়ে সুজিয়ে তাতে টেনে আনতে পারে না, বিষয়গত বা বিষয়ীগত উভয় শক্তির দ্বারাই চালিত হয়ে জনগণ নিজের থেকে একটি আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়। একই সঙ্গে নেতৃত্ব বা হেড্‌কোয়ার্টার বা কেন্দ্র একটি গণআন্দোলনে অপরিহার্য। এছাড়া কোন আন্দোলন হয় না। অন্যভাবে বললে একটি গণআন্দোলনে একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া থাকে, অথবা তা নিজেই হ'ল এমন একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া, যাতে জনগণের চেতনা ও স্বতঃস্ফূর্ত স্ব-ক্রিয়তা নেতৃত্বের মতাদর্শগত, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দিশার সঙ্গে একাত্ম হয়; 'স্বতঃস্ফূর্ততা ও সচেতন দিশার মধ্যে ঐক্য' হওয়া দরকার। জনগণের ওপর উপর থেকে নেতৃত্ব চাপিয়েও দেওয়া যায় না আবার রাজনৈতিকভাবে ক্রিয়াশীল জনগণ তাদের সঙ্গে একাত্ম একটি

নেতৃত্ব ছাড়াও চলতে পারেনা। এই প্রক্রিয়ার নির্ভুল মূল্যায়ণের ওপর নির্ভর করে, একটি গণ আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা অথবা তার নিজস্ব স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

অনুরূপ ভাবে একটি গণ আন্দোলনের রাজনৈতিক কাজের ভিত্তি হতে হবে জনগনের চেতনা, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বা 'স্বয়ংশাসিত ভাবে' গড়ে ওঠা ক্ষোভ ও মোহভঙ্গ এবং শোষণ ও দমনের সম্পর্কে ধারণা ও পরিবর্তনের চাহিদা এবং তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ক্ষমতা। কিন্তু নেতাদের কেবল জনগণের ডাকে সাড়া দিলে এবং গণ-চেতনাকে প্রতিফলিত করলেই চলবেনা, তাদের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে, শিক্ষিত করতে ও পরিচালিত করতে হবে। রাগ বা ক্ষোভ থাকলেও জনগণের হাতে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতাকে বা তাদের ক্ষোভের উৎসগুলিকে আয়ত্ত করার মতো বৌদ্ধিক হাতিয়ার নেই, যা দিয়ে তারা তাদের ক্ষোভের ভিত্তিতে সক্রিয় হতে পারে বা তাদের সামাজিক অবস্থার অর্থবহ বিকল্প গড়ে তুলতে পারে।[১] নিজের থেকে তারা এমনকি নিজেদের স্বার্থগুলি পুরোপুরি বা যথেষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম নাও হতে পারে। জটিল শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করতে ও জটিলভাবে বুঝতে নেতৃত্বের দরকার হয়। অনুরূপভাবে, নেতাদেরও জনগণের সংগ্রাম করার ক্ষমতায় আস্থা রাখতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে তাদের জনগণকে শিক্ষিত করতে হবে নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখতে এবং এই ক্ষমতাকে আরও বিকশিত করতে।

এবার যখন জনগণ ও নেতাদের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধ মিলে যায়, নেতৃত্বকেও জনগণের দাবী ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ব্যক্ত করতে হবে, রাজনীতি ও গণসংগ্রামের জন্য উপযুক্ত ধরনের এবং কার্যকর একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, জনগণকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে সংগ্রামের জন্য তৈরী করতে হবে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত এবং জনসমষ্টিকে সংগঠিত করতে হবে (যা কৃষিভিত্তিক সমাজের ক্ষেত্রে বেশী করে সত্য), জাতীয় স্তরে জনপ্রিয় রাজনীতি সৃষ্টি করতে হবে, যে জনগণ বা জাতি মিলিতভাবে সংগ্রাম করবে তাকেই সৃষ্টি করতে হবে, এবং নির্দিষ্ট ঐতি-হাসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, এমন নির্ভুল রণনীতি ও রণকৌশল তৈরী করতে হবে। নেতৃত্ব এই 'কর্তব্যগুলি' পালন না করলে সামাজিক দ্বন্দ্ব, স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ বা সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মৌলিক ইচ্ছা থাকলেও সামাজিক অবস্থার মূলগত পরিবর্তনে সক্ষম কোনো ধারাবাহিক গণসংগ্রাম গড়ে নাও উঠতে পারে। অথবা একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে, যা, অত্যন্ত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, গোড়া থেকেই অকার্যকর ও পরাজিত হতে বাধ্য। অথবা, নেতৃত্ব যদি বাস্তবতাকে

ঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয় বা ঐতিহাসিকভাবে তার অন্যান্য যত কাজ রয়েছে তা না করে উঠতে পারে, তবে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠা বা উপযুক্ত মাত্রায় পেঁছিনো হয়তো সম্ভব হবে না।[২]

বাস্তবে, জনগণের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব এবং স্বতঃস্ফূর্ততার বিরুদ্ধে সংগঠনকে দাঁড় করানো হ'ল একটি কপট দ্বৈততা। আসলে প্রশ্নটা হ'ল কীভাবে বাস্তব জীবনে একটি গণআন্দোলনে নেতারা এবং জনগণ বা অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। প্রশ্নটা হ'ল একটা আন্দোলনে "তলার থেকে চাপ এবং উপর থেকে নির্দেশের সামঞ্জস্য"[৩] থাকছে কিনা। ভারতীয় পরিস্থিতিতে, যদি রাজনৈতিক কর্মীরা ধরে নিয়ে থাকেন বা ইতিহাসবিদরা আজকে ধরে নেন যে ঔপনিবেশিকতার প্রধান শিকার জনগণের মধ্যে তাদের উপর শোষণ সম্পর্কে সচেতনতা বা তাদের সামাজিক অবস্থাকে উৎখাত করার ইচ্ছা এবং এই সচেতনতা বা ইচ্ছাকে বিকশিত করার ক্ষমতা, কোনোটাই ছিল না, তবে তা থেকে একটি নিষ্ক্রিয়, উচ্চমার্গীয় রাজনীতি বা জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চমার্গীয় দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হবে, যা সাম্প্রতিককালে খুব চালু হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল, উচ্চশ্রেণী বা ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদরা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মাধ্যমে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে জনগণকে চালিত করেছিল। আগেই বলেছি, এই ইতিহাসবিদ গোষ্ঠীগুলি. তাদের ঔপনিবেশিক পূর্বসূরীদের অনুসরণে হয় প্রাথমিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্বকে. নয়তো জনগণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে সম্পর্কে সচেতনতাকে এবং তার ক্রিয়াপদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে।[৪]

সেইসঙ্গে, প্রাথমিক দ্বন্দ্ব আপনা থেকেই জনগণের মধ্যে ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে একটি পূর্ণবিকশিত ধারণার এবং একটি ব্যবস্থা বা কাঠামো হিসাবে তাকে উৎখাত করার ইচ্ছা ও শক্তির জন্ম দেয়, এটা ভাবা মানে এমন এক চেতনার অস্তিত্বকে ধরে নেওয়া, যাকে সচেতনভাবে এবং ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ, শিক্ষিত ও বিকশিত করে যেতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আরও একটি ধারণা তৈরী হয়, যা হ'ল, জনগণ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সবসময়েই তৈরী, এবং জনগণের সবচেয়ে নির্যাতিত অংশগুলির মধ্যে এই সংগ্রামে যোগ দেওয়ার বা তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা ও সচেতনতা থাকে। বস্তুত, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীই নেতৃত্বের ভূমিকা ও গুণের গুরুত্বকে অস্বীকার করে, যার মধ্যে জনগণের অন্তর্গত, প্রবৃত্তিগত, জায়মান ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চেতনাকে ধরার, এবং তার সঙ্গে এই চেতনার বিকাশের এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক কাজের পথ রুদ্ধ করেছে যেসব বিরুদ্ধ উপাদান, অবস্থা, প্রক্রিয়া, বাধা, তাকে বোঝার, ক্ষমতা থাকা

দরকার।[৫] অন্যভাবে বললে, একটি পরিণত নেতৃত্বকে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী গণ চেতনার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তাকে পরিবর্তিত করতে হবে।[৬]

নরমপন্থী পর্যায়ে, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব মনোযোগ দিয়েছিল হেড-কোয়ার্টার গড়ে তোলার উপর, এবং তাও প্রাথমিকভাবে মতাদর্শগত স্তরে। জনগণকে দেখা হয়েছিল সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং রাজনৈতিকভাবে নিস্ক্রিয় রূপে, যদিও নরমপন্থীরা তাদের শিক্ষিত করে তোলার এবং ধীরে ধীরে ও কালক্রমে সক্রিয় রাজনীতিতে নিয়ে আসার আশা করতেন। অবশ্য, তাঁরা ঔপনিবেশিক শোষণ ভারতীয় জনগণের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে একটি জটিল উপলব্ধিতে পেঁছিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জনগণের মৌলিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাদের এই সংগ্রাম করার ক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা রাখতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা তাদের কাছে পেঁছিতেও পারেননি এবং জনগণের স্ব-ক্রিয়তার ভূমিকা ও গুরুত্বকে বুঝতেও পারেননি। জনগণকে দেখা হয়েছিল দাহ্য কাঁচামাল হিসাবে, তাদের মধ্যে তীব্র আন্দোলনমূলক ও অন্যান্য কাজকর্মের মাধ্যমে নেতৃত্বকে যাতে অগ্নিসংযোগ করতে হ'ত। গান্ধীর আমলেই কেবল জনগণ ও নেতাদের এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ও সংগঠনের মধ্যেকার যুক্তির একটি উন্নততর ধারণা ও অনুশীলন গড়ে ওঠে। সর্বোপরি, গান্ধীই এই যুক্তিকে মোটামুটি বুঝেছিলেন, জনগণের কাছে পেঁছেছিলেন, তাদের নিজস্ব কাজের ভিত্তিতে তাদের চালনা করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে, বিকশিত হতে এবং সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে কেবল তখনই, যখন জনগণ রাজনীতির বিষয়ী হয়ে ওঠে, বিষয় নয়। তাছাড়া, গান্ধীর যুগের নেতৃত্ব একইসঙ্গে জনগণের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চেতনার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ঔপনিবেশিক শোষণ সম্পর্কে নরমপন্থীরা যে জটিল ও বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, তার ভিত্তিতে জনচেতনাকে আরো শিক্ষিত ও বিকশিত করেছিল।

যদিও গান্ধী তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক কাজের সময় থেকেই জনগণ ও নেতৃত্বের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন, এবিষয়ে তিনি আরো বিস্তারিত ভাবনা চিন্তা করেছিলেন ১৯৩০-এর দশকে এবং ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে।

জনগণের লড়াই করার ক্ষমতা—তাঁদের নির্ভিকতা, সাহস, আত্মত্যাগের সামর্থ ও শক্তি সম্পর্কে গান্ধী অগাধ আস্থা রাখতেন। তাঁর সমগ্র রাজনীতিকেই তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের সংগ্রামী মনোভাব ও আত্মত্যাগের

চেতনার উপর। আইন অমান্য আন্দোলন ভেঙে যাবার পর কে. এফ. নরিম্যান ও অন্যান্যদের নিরুৎসাহ না হবার জন্য ১৯৩৪ সালে তিনি বলেছিলেন: "জাতির এমন উদ্যম রয়েছে যার সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই, কিন্তু আমার আছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে নেতৃত্বের "এই উদ্যমের উপর অসঙ্গত চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়।"[৭] তাকে এমন এক রণনীতি ও রণকৌশল অনুসরণ করতে হবে যা জনগণের *নির্ভিকতা*[৮] ও "*তাদের শক্তি সম্পর্কে* সচেতনতা"[৯] বাড়িয়ে তোলে। ১৯৪২ সালের জুনে লুই ফিশারের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বলেছিলেন যে তিনি কিভাবে আন্দোলন গড়ে তোলবার আশা করেন যেটা এক প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে পারবে। এই উত্তরের মধ্য দিয়েই গণচেতনা ও নেতৃত্বের মধ্যকার দ্বান্দিক সম্পর্কে তাঁর ধারণাস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন: "আমি জনগণের সহজাত প্রবৃত্তির কাছে আবেদন করবো। আমি তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি।"[১০] এর আগে, ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারীতে, প্রদেশগুলিতে সাধারণভাবে দমননীতির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে হরিজন পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন: "জনগণ যদি ভয় ত্যাগ করে এবং আত্মত্যাগের কলা রপ্ত করে, **তাদের কোনো দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন নেই।** পদাঘাতে তারা নুইয়ে পড়বে না। তাদের যা দরকার তারা গ্রহণ করবে এবং আত্মস্থ করবে।"[১১]

গান্ধী ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে গণ আন্দোলনের ভিত্তি হতে হবে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কেবলমাত্র অত্যন্ত উদ্দেশ্যচালিত কর্মীদের বা 'স্থায়ী সৈন্যবাহিনী' দিয়েই তাকে দীর্ঘকাল চালানো যাবে না। "লক্ষ লক্ষ নির্বাক জনতার শক্তি" দিয়েই তিনি ১৯৪২ সালে 'সেই সাম্রাজ্যের শক্তিকে প্রতিরোধের' পরিকল্পনা করেছিলেন।[১২] আন্দোলনের দাবী আদায়ের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে খুব বেশী পরিমাণে কাজে লাগালে যে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক নিস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি যে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন, তা দেখা যায় যখন ১৯৩৯ সালে রাজকোটে তাঁর অনির্দিষ্টকাল অনশনের পর তিনি গুইয়ার রোয়েদাদ থেকে পিছিয়ে আসেন। রাজকোটের মানুষকে তিনি বলেন: "তোমাদের উদ্যমে মরচে পড়ে যেতো, এবং তোমাদের হাতগুলি পঙ্গু হয়ে যেতো।"[১৩] অন্যভাবে বললে, দাবী আদায় নয়, কীভাবে তা আদায় করা হ'ল সেটাই গুরুত্বপূর্ণ; এখানে জনগণের অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক শিক্ষাই বড় কথা।

গান্ধী অক্লান্তভাবে একথা বলতেন যে আন্দোলনের স্রষ্টা নেতারা নয়, জনগণ। জনগণকে তাদের নিজস্ব একটা আন্দোলনের দিকে এগোতেই হ'ত। নেতারা কেবল তখনই আন্দোলন 'শুরু' করতে ও তাকে নেতৃত্ব দিতে পারতো, যখন তারা জনগণের মানসিকতাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারতো।

তারা তাকে কেবল সেই দিশাই দিতে পারতো, যা মূলত বা আভ্যন্তরীণ-ভাবে জনগণের ঝোঁক, ইচ্ছা বা চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৯৩৮-৩৯-এ রাজ্যগুলির প্রতি কংগ্রেসের নীতি হস্তক্ষেপ না করার থেকে হস্তক্ষেপ করায় পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গান্ধী ১৯৩৯ সালের ২৮ জানুয়ারী 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন : "রাজ্যগুলির জনগণ যখন জাগ্রত হয়নি, তখন কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ না করার নীতি ছিল, আমার মতে, কূটনৈতিক বুদ্ধির একটি নিখুঁত উদাহরণ। যখন রাজ্যগুলির জনগণের মধ্যে সার্বিক জাগরণ এবং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দীর্ঘ কষ্টকর পথে চলার দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে, সেই সময় এই নীতি হবে কাপুরুষতা।...যে মুহূর্তে তারা (জনগণ) প্রস্তুত হয়েছে, আইনগত, সাংবিধানিক এবং কৃত্রিম বেষ্টনী ভেঙে গেছে।"[১৪] ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯-এর 'হরিজন' পত্রিকায় একটি অসাধারণ রচনায় তিনি নেতৃত্ব, গণ জাগরণ ও গণ আন্দোলনের রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে সূত্রবদ্ধ করেন : 'তথাপি লক্ষ লক্ষ মানুষের জাগরণ ঘটতে সময় লাগে। সেটা তৈরি করা যায়না। এটা আসে অথবা অলক্ষিতে আসে বলে মনে হয়। জাতীয় কর্মীরা কেবল জনমনকে আগে থেকে বুঝতে পারার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারেন।"[১৫]

নেতৃত্ব যে খুশীমতো জনগণকে চালিত করতে পারে না এবং জনগণ ও তাদের রাজনীতির একটা স্বাতন্ত্র্য থাকে, যার সঙ্গে নেতাদের ইতিবাচক সংযোগ স্থাপন করতে হয়, তা গান্ধী স্পষ্ট করে বলেছিলেন ১৯৪২ সালে প্রস্তাবিত ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে। কংগ্রেস নেতাদের "রুশ ও চীনাদের পাশে দাঁড়ানোর কোনো নৈতিক দায়িত্ব আছে কি না", এই বিষয়ে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্‌ল'-এর স্টুয়ার্ট এমেনির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এটা যদি একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্ন হতো, আপনি যা বলছেন তা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল। কিন্তু এমনকি ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেক সদস্যের মিলিত প্রভাব দ্বারাও জনগণকে মিত্রশক্তির লক্ষ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয়, যা তারা বোঝেনা, বুঝতে পারেনা।" কিন্তু নিশ্চয়ই এমেনি বলেছিলেন, 'আপনি চাইলে জনগণের ওপর আপনার বিপুল কর্তৃত্বের বলে কিছু একটা করতে পারতেন। তারা নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনতো।" গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন : "আমার এমন এক প্রভাব আছে বলে আপনি বলছেন, আমি আপনাকে বলছি, আমি চাইলেও যার অধিকারী নই।' জনগণকে নিজের দিকে টেনে আনার ব্যর্থতার দুটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, "আমার প্রভাব, বাইরে থেকে দেখতে বিপুল হলেও, অবশ্যই সীমাবদ্ধ। জনগণের অভাব-অভিযোগ মেটানোর জন্য আন্দোলন গড়ে

তোলার মতো যথেষ্ট প্রভাব হয়তো আমার আছে, **কারণ জনগণ প্রস্তুত এবং তাদের একজন সাহায্যকারী দরকার।** কিন্তু আমার এমন কোনো প্রভাব নেই যে জনগণের উদ্যমকে তাদের আগ্রহ নেই এরকম কোনো খাতে বইয়ে দেবো।"[১৬]

১৯৪৭ সালে যখন এক সহকর্মী তাঁকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেননি, তিনি বলেন :[১৭] আমি জীবনে কোনো পরিস্থিতিই সৃষ্টি করিনি। আমার একটা গুণ আছে যা আপনাদের অনেকেরই নেই। আমি প্রায় প্রবৃত্তিগতভাবে বুঝতে পারি জনগণের অন্তরে কী নাড়া দিচ্ছে। এবং যখন আমি বুঝি যে ভেতরে শুভশক্তি ক্ষীণভাবে নড়াচড়া করছে, আমি তখনই তাদের ধরি এবং কর্মসূচী তৈরী করি। এবং তারা সাড়া দেয়। লোকে বলে আমি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি ; কিন্তু আমি যা বিদ্যমান রয়েছে তাকে রূপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিনি। আজ আমি সেইরকম স্বাস্থ্যকর অনুভূতির কোনো লক্ষণই দেখছি না। এবং তাই আমি সময় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।

জনগণের কার্যকলাপের সঙ্গে নেতাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সম্পর্ক নিয়ে শেষ দুটি উদ্ধৃতি দেবো। সুভাষ বোস-এর সঙ্গে ১৯৩৯ সালের মত-বিরোধের সময় গান্ধী তাঁকে লিখেছিলেন : "আমার মর্যাদার কোনো গুরুত্ব নেই। তার স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই···ভারতবর্ষের উত্থান বা পতন ঘটবে তার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজের যোগফলের উৎকর্ষের ওপর দাঁড়িয়ে। ব্যক্তি তা সে যত উঁচুতেই থাকুক না কেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে ছাড়া তার আর কোনো গুরুত্বই নেই।"[১৮] এর আগে, ১৯১৫ সালে মাদ্রাজে এক স্বাগত ভাষণের জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সাধারণ মানুষরা তাঁর সঙ্গে লড়াই করেছিল তাদের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন : "আপনারা বলেছেন যে আমি এই মহান নারী ও পুরুষদের উদ্দীপিত করেছি, কিন্তু আমি একথা মেনে নিতে পারছি না। এইসব সরল মানুষরা, যারা বিন্দুমাত্র পুরষ্কারের আশা না রেখে বিশ্বাসে ভর করে কাজ করে গেছে, তারাই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, আমাকে ঠিক স্তরে রেখেছে, এবং তাদের বিপুল আত্মত্যাগ, বিপুল বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি বিপুল আস্থার মাধ্যমে আমি যে কাজ করতে পেরেছি তা করতে বাধ্য করেছে।"[১৯]

একই সঙ্গে, গান্ধী যে কোনো গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অপরিহার্যতার ওপর জোর দিয়েছেন।[২০] তিনি প্রায়শই যে রূপক ব্যবহার করতেন তা হ'ল একটি সৈন্যদলের, যেখানে সেনা ও সেনানায়করা আবশ্যক অথচ পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের খোলামেল ও গণতান্ত্রিক চরিত্র সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছেও এটা পরিষ্কার ছিল যে

একটি দৃঢ়, ছেদহীন ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব এবং অভিন্নমনা কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফলত, প্রত্যেক গণ আন্দোলনের শুরুতে গান্ধীর নেতৃত্বের আবশ্যকতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[২১]

পার্টি ও আন্দোলনের মধ্যে গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি ও অবাধ মতপ্রকাশের ভূমিকার ওপর[২২] এবং সংগ্রামে জনগণের প্রাথমিক ভূমিকার ওপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী শৃঙ্খলার ওপর জোর দিতেও দ্বিধা করেননি। তিনি বারবার বলেছেন, বিশেষত ১৯৩৯ সালে যখন দেশ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, যে একটি গণ আন্দোলন হ'ল যুদ্ধের মতো এবং একজন সত্যাগ্রহী হ'ল অহিংস সেনাবাহিনীর সৈনিক। তাকে সৈনিকের মতো লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা মানতে হবে। সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়েই রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। এটা আরো বেশী করে সত্যি যখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতো এক বিশাল শক্তির সঙ্গে, যা হ'ল "পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও সংগঠিত কর্পোরেশন", যুদ্ধে—"জীবন-মরণ সংগ্রামে"—নিয়োজিত হচ্ছে। নেতা তাদের আস্থা হারালে তাকে পাল্টানোর অধিকার জনগণের আছে। তখন তাদের তার জায়গায় আরেকজন বসাতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ তারা কাউকে নেতা বলে মানবে, তার কর্তৃত্বকেও মেনে নিতে হবে ; নেতা তাদের দ্বারা চালিত হতে পারে না। গণ আন্দোলনের নেতা হ'ল একজন চিকিৎসক বা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানায়কের মতো ; একদল লোকের জনপ্রিয় প্রতিনিধির মতো নয় (এবং নেতৃত্ব হ'ল সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের মতো)। তার কর্তৃত্ব মানতেই হবে ; তার নির্দেশ পালন করতেই হবে।[২৩]

গান্ধীর যুগের গণআন্দোলনগুলির রীতি ও চলনের মধ্যে আন্দোলনের রণনীতির মূল সূত্রগুলি এবং নেতৃত্ব ও অনুগামী জনগণ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ও সংগঠনের সম্পর্কের চরিত্রকে দেখা যায়।[২৪] প্রত্যেক আন্দোলন, যা আদতে কর্তৃত্বমূলক ছিল, যত্নের সঙ্গে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। জনগণের প্রস্তুতির মাত্রা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছিল—এবং এখানে নেতৃত্বের স্বভাবগত গুণের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।[২৫] গান্ধী জনগণকে সক্রিয়ভাবে সংগ্রামের জন্য তৈরী করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেতনার বিকাশের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। আন্দোলনের লয়কে ধীরে ধীরে জনগণের লয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে গড়ে তোলা হয়েছিল, রাজনীতির বিভিন্ন সূত্রকে নেতৃত্বের হাতে জড়ো করা হয়েছিল, জনমত তৈরী করা হয়েছিল, ভারতীয় জনগণ, ব্রিটিশ জনগণ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্বের উপকরণগুলি একত্রিত করা হয়েছিল, এবং ক্যাডার ও কর্মীদের একটি সমসত্ত্ব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছিল।[২৬] 'শত্রু'কে

ভুল প্রমাণ করে অথবা যতগুলি সম্ভব অ-কংগ্রেসী গোষ্ঠীকে দলে টেনে, তাদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে, বা তাদের নিরপেক্ষ করে রেখে, তাকে বিচ্ছিন্ন করার সমস্ত চেষ্টাই করা হয়েছিল। প্রান্তবর্তী শক্তিদের, বিশেষ করে উদারপন্থী ও ব্রিটিশ লেবার পার্টি'র লোকেদের হৃদয় জয় করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালানো হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল তিনটি মূল রণকৌশলের দ্বারা। প্রথমত, দাবী আদায়ের জন্য সমস্ত সাংবিধানিক ও আইনী পদ্ধতিই নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অবিরাম আপোষ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাতে এটা প্রতিপন্ন হয় যে সরকারই সমাধানের পথ আটকাচ্ছে।[২৭] এটাকে আরো ভালো করে দেখানোর জন্য কোনো, আন্দোলন শুরু করার যথেষ্ট আগে থাকতে সরকারকে নোটিশ বা হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয়ত, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে কাজ করা হয়েছিল তা হ'ল, আন্দোলন শুরুর সময় যত এগিয়ে আসতো, দাবীগুলিকে তত কমিয়ে আনা হ'ত, যাতে চিত্তাকর্ষকভাবে, জনগণ এবং মাঠের ধারের দর্শকরা দেখতো যে জাতীয় আন্দোলনের ওপর সংগ্রামকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সংগ্রাম ছাড়া জনগণের সামনে আর কোনো রাস্তাই নেই, এবং এর ফলশ্রুতিস্বরূপ সমস্ত দুঃখকষ্টের দায় সরকারের। কিন্তু বৃহত্তর দাবীকে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতর দাবীতে নামিয়ে আনার কারণ দুর্বলতা, আপোষের সুবিধা অথবা সংগ্রামকে সংকীর্ণ করে ফেলা বা এড়িয়ে যাওয়া ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিকতাবিরোধী শক্তিদের হাতে বিপুল নৈতিক ও কর্তৃত্বমূলক রসদ রাখা। সংকীর্ণতর দাবী ভিত্তিতে আন্দোলন কোনো আংশিক দাবীর জন্য আংশিক আন্দোলন ছিল না, তা ছিল বৃহত্তর সীমাহীন আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার প্রবেশ মুখ। এর সঙ্গে আংশিক আন্দোলনের তফাৎ ছিল এই, যে এতে সবসময়েই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত ঘটতো। ১৯২৮ সালে বরডোলির জমির খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সঙ্গে ১৯৩০ সালে খেড়ার খাজনা বন্ধ আন্দোলনের তফাৎ বোঝাতে গিয়ে গান্ধী লেখেন: "বরডোলির সংগ্রাম ছিল সুযোগের দিক থেকে কিছুটা সীমিত। তা ছিল একটি অধিকার আদায়ের আন্দোলন। এটা হ'ল সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম। একটির সঙ্গে আর একটির আকাশ-পাতাল তফাৎ।"[২৮] অন্যভাবে বললে, দাবীর মাত্রা নয়, কর্তৃত্বের রসদের মাত্রাই ছিল বিচার্য বিষয়।[২৯] উপরন্তু কোনো অবস্থাতেই দাবীকে নামিয়ে আনা হয়নি যদি তার ফলে জাগ্রত জনগণকে নিরুদ্যম করে ফেলার সম্ভাবনা থাকতো।[৩০]

যখন নেতৃত্ব বা হেডকোয়ার্টার কোনো আন্দোলনের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রস্তুতির পর তা শুরু করতো, কংগ্রেসের নীচের তলার সংগঠন ও ক্যাডারদের কাজ হ'ত, নিজেদের উদ্ভাবনীশক্তি ও উদ্যোগকে পুরোপুরি

কাজে লাগিয়ে প্রকৃত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। কেবল দুটি পূর্বশর্ত ব বিধিনিষেধ ছিল : নেতৃত্ব উদ্যোগ নিলে তবেই আন্দোলন শুরু হবে এবং নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলে তা থামবে : এবং তাকে অহিংস থাকতে হবে।' উচ্চতর নেতৃত্ব সাধারণত কারারুদ্ধ হ'ত। কিন্তু যারা বাইরে থাকতো তারা প্রাথমিকভাবে সমন্বয়কারী বা তথ্যকেন্দ্র হিসাবে কাজ করতো। গণ আন্দোলনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে উঠে আসা উদ্যোগ ও উদ্ভাবনীশক্তির প্রতি কেবল আন্দোলন উন্মুক্ত ছিল তাই নয়, তার ওপর আন্দোলন বিশেষভাবে নির্ভর করতো। বস্তুত, গান্ধীর যুগের আন্দোলনগুলি গড়ে উঠতো এর দ্বারা।[৩১] নেতৃত্ব আন্দোলনকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে তৈরী করে দিত, এবং আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী ঠিক করে দিত, কিন্তু খুব কম সময়েই উল্লেখযোগ্য কোনো সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিত।[৩২] এটা করা যথেষ্ট কঠিনও ছিল, কারণ এই আন্দোলনগুলি ছিল খোলামেলা আন্দোলন, যার নেতৃত্ব, সংগঠন ও তহবিলের ওপর যেকোনো সময়েই সরকারের কোপ পড়তে পারতো। যেহেতু গান্ধী গোপনীয়তা ও গোপন সংগঠনের বিরোধী ছিলেন, নেতৃত্ব এগুলির সাহায্য নিতে পারতো না এবং দমন পীড়নের কাছে পুরো পুরি 'উন্মুক্ত' ছিল। যেটুকু গোপন সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল তা ছিল স্থানীয় ক্যাডারদের উদ্যোগে এবং তাদেরই স্তরে সীমাবদ্ধ।

সুতরাং, আন্দোলনের গণ স্তরে উদ্যোগ, উদ্ভাবনীশক্তি ও সৃজনশীলতার পূর্ণ সুযোগ ছিল, এবং তা বিদ্যমান ছিল—এবং গড়ে তোলা হয়েছিল—গান্ধীবাদী আন্দোলনের কাঠামোরই মধ্যে।

প্রকৃত আন্দোলনগুলি, যেভাবে তৃণমূল স্তরে জনগণ তা চালিত করতো একমাত্র যে স্তরে গণ আন্দোলন হয়, তা অধ্যয়ন করলে দেখা যায় কত বিচিত্র-ভাবে এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে এই আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্য-জনকভাবে, কেবল হিতেশরঞ্জন সান্যাল ও শশী যোশীর মতো কয়েকজন ছাড়া কেউই আন্দোলনকে এই স্তরে অধ্যয়ন করেননি। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্যর ভিত্তি হ'ল দেশের অধিকাংশ জায়গার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার যা দুর্ভাগ্যবশত এখনো সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ ও অধ্যয়ন করা যায়নি। কিন্তু কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৩০ সালের দ্বিতীয়ভাগে, যখন বৃষ্টির জন্য বেআইনি লবণ তৈরী কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, একজন তরুণ কমিউনিস্ট, এস জি সরদেশাই কংগ্রেসের নামে এবং কংগ্রেস নেতা শঙ্কররাও দেওর অনুমোদন নিয়ে আকোলা জঙ্গল সত্যাগ্রহর কর্মসূচী উদ্ভাবন করেন ও তাতে নেতৃত্ব দেন। মহারাষ্ট্রের তালুক স্তরের তরুণ নেতা ও কট্টর গান্ধীবাদী ডি কে কুন্তে সেকথা শুনে

কোনো উচ্চতর নেতাকে না জানিয়ে বা তার অনুমোদন না নিয়েই আলিবাগে ঐরকম একটি জঙ্গল সত্যাগ্রহ সংগঠিত করেন। বস্তুত, লবণ সত্যাগ্রহই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসীম বৈচিত্র্য নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৩০-৩৪ এবং ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে তালুক ও জেলা স্তরে শতশত বেআইনী সাইক্লোস্টাইল করা বা হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। রূপ, বিষয়-বস্তু ও প্রচার পদ্ধতির দিক থেকে এগুলি সম্পূর্ণ 'স্বনিয়ন্ত্রিত' ছিল। বরডোলি ও খেড়া সত্যাগ্রহ, চিরালা-পিরালার আন্দোলন, এবং গণ আন্দোলনের পর্যায়ের শতশত স্থানীয় সত্যাগ্রহে জনগণ তাদের বিচিত্র সৃজন-শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছিল। উপরন্তু, সবসময় না হলেও মাঝে মাঝেই, পরিচিত ও পরীক্ষিত নেতাদের গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন চলতো স্থানীয়, অতি তরুণ ও অনভিজ্ঞ কর্মীদের নির্দেশে, যারা কোনো নির্দেশাবলী ছাড়াই চলতে বাধ্য হ'ত এবং তাদের সৃজনীশক্তি ও তারুণ্যের উদ্যমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতো।[১]

১৯৪২ সালে অবশ্যই নেতৃত্ব আগামী আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ৮ই অগাস্ট ১৯৪২ এর এ আই সি সি'র প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সব স্তরে কংগ্রেস কমিটিগুলির কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায়, "এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ-কারী প্রত্যেক নারী ও পুরুষ (গান্ধীজীর) সাধারণ নির্দ্দেশের চৌহদ্দির মধ্যে নিজে নিজে কাজ চালিয়ে যাবে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আগেকার আন্দোলনগুলিতেও কার্যক্ষেত্রে এটা সমানভাবে সত্যি ছিল, বিশেষত ১৯৩০ ও ১৯৩২-৩৩ সালে, যখন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও অনেক ক্ষেত্রে জেলা ও তালুক স্তরে নেতৃত্বকে অল্প সময়ের মধ্যেই কারারুদ্ধ করে ফেলা হয়েছিল এবং কংগ্রেস সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নীচু স্তরের কর্মীদের এবং জনগণের এই 'স্বতন্ত্র' উদ্যোগ কংগ্রেসের 'সরকারী' রণনীতির বিরোধী ছিল না তা ছিল এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এর মূলগত ধারণা।

পাদটীকা

১ গ্রামশি বলেছেন "সমালোচনামূলক আত্ম-চেতনা মানে, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক-ভাবে, বুদ্ধিজীবীদের একটি এলিট সৃষ্টি হওয়া। সবচেয়ে প্রসারিত অর্থে, সংগঠিত না হলে, একটি মানবগোষ্ঠী নিজেকে 'সুনির্দিষ্ট' করে না, স্বীয় অধিকারে স্বতন্ত্র হয় না, এবং বুদ্ধিজীবীদের ছাড়া অর্থাৎ সংগঠক ও নেতাদের ছাড়া সংগঠন হয় না।' 'সিলেকশনস ফ্রম দা প্রিজন নোটবুকস', পৃ ৩৩৪। তেভাগা কৃষক আন্দোলনে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে সুনীল সেন আমাদের বলেছেন, একটি আশু দাবী

আদায়ের জন্য, বা একটি অন্যায় আইন বা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বতস্ফূর্ত চেতনা থাকবেই, কিন্তু সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে হলে ওপর থেকে সচেতন নির্দেশ থাকা দরকার।

২. এর একটি নির্দেশক হ'ল আমাদের সমসাময়িক র‍্যাডিকাল পার্টি ও গোষ্ঠীর চরম দারিদ্র্য ও দুরবস্থায় বসবাসকারী এবং তীব্র অসন্তোষ ও সামাজিক ক্রোধে পরিপূর্ণ জনগণকে এইসব পার্টি বা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বা নিজের থেকে, সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার ব্যর্থতা।

৩. গ্রামচি, পূর্বোল্লিখিত, পৃ, ১৪৮।

৪ এর থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণা হতে পারে। যেহেতু এটা মনে করা হচ্ছে যে জনগণের নিজস্ব কোনো ঔপনিবেশিকতা বিরোধী বা জাতীয়তাবাদী চেতনা থাকতে পারে না কেবলমাত্র তাদের শ্রেণীগত প্রবৃত্তির প্রতি আবেদন করে, তাদের শ্রেণীগত দাবীগুলি তুলে ধরে এবং তারপর উপনিবেশবাদ তাদের শ্রেণীশত্রুদের সমর্থন করে, এটা দেখিয়েই তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে টেনে আনা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রেণীগত প্রবৃত্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করলেও, জাতীয় বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবৃত্তির অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গী শুধু স্বতস্ফূর্ত বা স্বতন্ত্রভাবে জনগণের মধ্যে বিকশিত জাতীয় বা ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চেতনাকে অস্বীকার করে না। অনিবার্যভাবে প্রাথমিক দ্বন্দ্বকে ভোঁতা করে দেয় এবং ঔপনিবেশিক সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি মনোনিবেশ করে।

৫ এগুলি বশ্যতার সম্পর্ক বা শক্তিই হতে পারে যেমন সামগ্রিক বাস্তবতাকে দেখার অক্ষমতা, ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও সংখ্যার দিক থেকে ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে তোলার মতো সাংগঠনিক ক্ষমতা না থাকা, নেতৃত্বের অভাব, ইত্যাদি।

৬ গ্রামচি বলেছেন "কিন্তু উদ্ভাবনগুলি, অন্তত গোড়ার দিকে জনগণের কাছ থেকে আসতে পারে না, একটি এলিটের মধ্যস্থতা ছাড়া, যাদের কাছে মনুষ্যক্রিয়ার অন্তর্গত ধারণা ইতিমধ্যেই কিছুটা পরিমাণে একটি সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সদা-বিদ্যমান সচেতনতা, এবং একটি নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত ইচ্ছা হয়ে উঠেছে।" ঐ, পৃ ৩৩৫। এই অনুচ্ছেদের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে জোসেফ ভি ফেমিয়া বলেছেন যে গ্রামচির কাছে "পার্টি হ'ল সেই প্রয়োজনীয় মধ্যস্থতাকারী শক্তি, যা জনগণকে তাদের মোহাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। "গ্রামচিস পলিটিক্যাল থট", পৃ, ১৩৬।

৭. কালেক্টেড ওয়ার্কস্, খণ্ড ৫৭, পৃ, ৪৫৪।

৮ ঐ, খণ্ড ৫৫, পৃ, ৪২৯।

৯. ঐ, খণ্ড ৬৮, পৃ, ৩১৯।

১০. ঐ, খণ্ড ৭৬, পৃ, ৪৫০।

১১. ঐ, খণ্ড ৬৮, পৃ, ৩৭৫ (জোর আমাদের)।

১২. ঐ, খণ্ড ৭৬, পৃ, ৩৯৭। একজন সাংবাদিক যখন প্রশ্ন করেন, গান্ধী ও নেহরু গ্রেপ্তার হলে আন্দোলন ভেঙে যাবে কিনা, গান্ধী বলেন, "না, যদি আমরা জনগণের মধ্যে কাজ করে থাকি তাহলে তা হবে না।" ঐ, পৃ, ১৯৩।

১৩. ঐ, খণ্ড ৬৯, পৃ, ২৭৪। আরও দেখুন, ঐ, পৃ, ২৭৪-৭৫।

১৪. ঐ, খণ্ড ৬৮, পৃ, ৩২৬-২৭।

১৫. ঐ, পৃ ৩৮১। আগে, জনগনের ওপর ধ্যানধারণা (এক্ষেত্রে রোমান লিপি) চাপিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন "এইসব চাপিয়ে দেওয়া জিনিস ভেসে যাবে যখন প্রকৃত গণ জাগরণ আসবে, তা আসছে. জানা কারণ থেকে আমাদের যে কেউ যা ভাবছি তার থেকে অনেক তাড়াতাড়ি।" ঐ।

১৬. ঐ, খণ্ড ৭৬, পৃ ৩০০ (জোর আমাদের)। এ বিষয়ে আরও জোর দিয়ে একটি ছোট চিঠিতে তিনি বলেছেন: "৬ এপ্রিল ১৯১৯-এ যে জাগরণের প্রকাশ ঘটেছিল, তা প্রত্যেক ভারতীয়কেই চমকে দিয়েছিল। সেদিন আমরা দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে যে সাড়া পেয়েছিলাম, যেখানে কোনোদিন কোনো জনবর্মী ছিলনা, আমি আজ তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারি না। আমরা তখন জনগণের মধ্যে যাইনি, আমরা জানতামই না যে আমরা তাদের মধ্যে যেতে পারি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।" ঐ, পৃ ৩০২।

১৭. এন কে বোস, "মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ আ গান্ধীয়ান--২", বিমল প্রসাদ, গান্ধী, নেহরু অ্যান্ড জে পি পৃ ৩১ এ উদ্ধৃত।

১৮ কালেকটেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৬৯, পৃ ৯৭।

১৯. ঐ, খণ্ড ১৩, পৃ ৫২-৩।

২০. উদাহরণস্বরূপ দেখুন. ঐ, খণ্ড ৫৫, পৃ ৪২৮।

২১. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ৮ আগস্ট ১৯৪২-এর এ. আই. সি. সি.র 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব, তেন্দুলকার পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ৬, পৃ ১৫১।

২২ সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টায় বিরোধিতা করে পার্টির শৃঙ্খলা ভাঙ্গা ও পার্টির নির্দেশ অমান্য করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব লেখার পর গান্ধী সুভাষ বোসের 'ওয়ার্কিং কমিটির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ও তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করার পূর্ণ অধিকার"কে সমর্থন করেন। তিনি আরও বলেন "এবং যারা ওয়ার্কিং কমিটির পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন তাদের অবশ্যই অধিকার রয়েছে সুভাস বাবুর পক্ষে যে কোনো বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার। এই সরল নিয়ম না মানলে আমরা কখনোই গণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারবো না।" বিতর্কের দুই পক্ষই ওয়ার্কিং কমিটি ও সুভাষচন্দ্রের পক্ষে, সভা করতে পারতো। "এই সভাগুলি, দুই পক্ষেরই, জনমতকে শিক্ষিত করার মাধ্যম রূপে দেখতে হবে।" শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "এটা যদি সত্যি হয়, যা বাস্তবিক, যে কোনো সংগঠন এই ক্ষমতা ছাড়া চলতে পারে না, তাহলে এটাও সমানভাবে সত্যি যে এই ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ করে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব রক্ষা করার অধিকার নেই। তা সম্ভব নয়। নিশ্চিতভাবেই তা জনসমর্থন হারিয়েছে।" কালেকটেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৭০, পৃ ১৫০-১। অনুরূপভাবে, ৮ আগস্ট ১৯৪২-এ তাঁর বিখ্যাত "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" বক্তৃতার শুরুতেই তিনি কমিউনিস্টদের অভিনন্দন জানান, যারা তাদের সংশোধনী প্রস্তাব ভোট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। তিনি বলেন, "এতে তাদের লজ্জার কিছু ছিল না। গত কুড়ি বছর ধরে আমরা শিখতে চেষ্টা করেছি অসহায় সংখ্যালঘু এবং হাসির খোরাক হয়েও কিভাবে সাহস রাখতে হয়। আমরা ঠিক পথে চলছি. এই

ভরসায় আমাদের বিশ্বাস আকড়ে ধরে থাকতে শিখেছি। তা আমাদের বিশ্বাসকে ধরে রাখার সাহসকে লালন করতে বলে, মানুষকে মহত্তর করে এবং তার নৈতিক অবস্থাকে উন্নত করে। তাই আমি খুশি এই দেখে যে আমাদের বন্ধুরা সেই নীতিগুলিকে গ্রহণ করেছেন যা আমি বিগত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।" ঐ, খণ্ড ৭৬, পৃ ৩৮৮।

২৩. ঐ, খণ্ড ৬৭, পৃ ২২৫-৬, ৪০১; খণ্ড ৬৯, পৃ ২৫৭, ২৭৩-৪; খণ্ড ৭০, পৃ ১১২-৩ ২৫০। ১৯৩৯ সালে পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবেও এই বক্তব্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। তেন্দুলকার, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ৫, পৃ ১৫৫।

২৪. গান্ধীর রচনায় বিশদ তত্ত্ব না থাকায়, এই অংশের পুরোটাই আমাদের সাক্ষাৎকার ও আন্দোলনের 'অধ্যয়ন'-এর ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। বিছু বিছু দিক সম্পর্কে অবশ্য গান্ধীর ইতস্তত মন্তব্য রয়েছে। সাক্ষাৎকারের সংখ্যা এত যে আলাদা করে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অচ্যুৎ পটবর্ধন এবং তরুণ তালুকদারের নেতা মাধবলাল শঙ্করলাল পাণ্ডিয়া এবং ডি. কে. কুন্তের সাক্ষাৎকার এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

২৫. ১৯৩৯-এ গান্ধীর সঙ্গে সুভাষ বোসের মতান্তর মূলত এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। গান্ধী নিশ্চিত ছিলেন যে একটি গণ আন্দোলনের জন্য জনগণের প্রস্তুতি, বা কংগ্রেস সংগঠনের তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অবস্থা, কোনোটাই তখনো ছিল না। মাধবলাল শঙ্করলাল পাণ্ডিয়ার কথা অনুসারে, গান্ধী জনগণের প্রস্তুতি অনুসারে চলতেন, তত্ত্ব থেকে নির্ণয় অথবা নেতাদের বক্তৃতা অনুসারে নয়। নেতারা, পাণ্ডিয়া বলেন, সবসময়েই বড় বড় কথা বলতেন, কিন্তু জনগণ ছিল অন্যরকম এবং অনেক বেশী বাস্তববাদী। অনুরূপভাবে, তিনি বলেন যে গান্ধী একটি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিরূপণ করতেন 'জোরদার' এলাকাগুলি দেখে যেমন বরডোলি, বোরসাদ। তারা যদিও তৈরী না থাকতো, তবে দেশ তো তৈরী ছিলই না।

২৬. কালেক্টেড ওয়ার্কস্, খণ্ড ৬৮, পৃ ১৩২। এই কৌশল, যা ১৯৩০-এ এত কার্যকর হয়েছিল, ১৯৩১-৩২-এ গান্ধী ব্রিটেন থেকে ফিরে এসে আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ পাওয়ার আগেই উইলিংডন রোধ করেন। ১৯৪২-এর আগস্টে আবার আচমকা ধর্মঘট হয়, কিন্তু গান্ধী ও কংগ্রেস, যতটা দরকার ততটা না হলেও, খানিকটা জমি তৈরীর কাজ করেছিলেন।

২৭. উইলিংডনের প্রশাসন এই কৌশলকে রোধ করে ১৯৩১-৩২-এ এবং ১৯৩৩-৩৪-এ, যখন তা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে অস্বীকার করে।

২৮. ঐ, খণ্ড ৪৩, পৃ ৩৪০-১।

২৯. এই দিকটা সরকারেরও চোখে পড়েছিল। তাই সরকার আন্দোলনের আপাত দাবীগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট দাবীগুলিকেও স্বীকার করেনি বা করতে চায়নি। বিশ্বনাথ মাথুর আমাদের বলেছেন যে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা লবণ তৈরী করাকে আন্দোলনের মূল বিষয় করায় হেসেছিলেন, কিন্তু জনগণের সাড়া দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

৩০. গান্ধী, কালেক্টেড ওয়র্কস্, খণ্ড ৬৯, পৃ ৩১৭-৮, ৩৫৫-৬।

৩১. আমি এমন কোনো আন্দোলনের কথা ভাবতেই পারি না যাতে নেতৃত্ব আন্দোলন শুরু করার ও থামাবার অথবা সংগ্রামের রূপ নির্ধারণ করবার অধিকার রাখবে না বা চাইবে না। আন্দোলনের আলোচনা হওয়া উচিত এই অধিকারের ওপর জোর দেওয়া নিয়ে নয়, নির্দিষ্ট ও বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় তার প্রয়োগ নিয়ে। অহিংসা সম্পর্কে চূড়ান্ত নিয়ম বেঁধে দেওয়া ছাড়া গান্ধী আন্দোলনকে নীচের, কার্যকর স্তরের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টা করেননি। খুব বেশী হলে, কেউ চাইলে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু তখনো তিনি প্রায়শই স্থানীয় পরিস্থিতির প্রতি নজর দেওয়ার গুরুত্বকে জোর দিয়েছেন। ১৯৩৯ সালের রাজকোট ও জয়পুরের সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলি দেখুন।

৩২. নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে সম্পূর্ণ সম্পর্কটিই প্রতিফলিত হয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে সম্পর্কের চরিত্রের ভেতর। এই সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সমতা, কমরেড সুলভ আচরণ, পারস্পরিক মর্যাদা, পদবৈষম্যের অভাব এবং বিরোধী মত প্রকাশের স্বাধীনতা। গান্ধীবাদী, সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট সহ আমরা যতজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, সবাই এই দিকের ওপর জোর দিয়েছেন এবং গ্রাম-তালুক-জেলা স্তরের বা আরও উপরের স্তরের রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনের কর্মী বা পদাধিকারীদের মধ্যে 'পৃষ্ঠপোষক', 'উপ-ঠিকাদার' বা 'দালাল' ধরনের যোগসূত্রের তত্ত্বগুলিকে তীব্রভাবে খণ্ডন করেছেন।

৩৩. ১৯৩৭ থেকে সি. এস. পি. ও সি পি. আই. সমানে গান্ধীর সমালোচনা করেছে আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতি না নেওয়ার জন্য, এবং তারপর এটা করতে তাঁর ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে চেষ্টা করেছে। যে কারণটির কথা সাধারণত বলা হ'ত তা হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণীর দোদুল্যমান চরিত্র, তার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করার প্রবণতা বা জনগণের জঙ্গী হয়ে ওঠাকে ভয় পাওয়া। তারা বোঝেনি যে গান্ধী ক্রমাগত তাঁর নিজের মতো করে আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিলেন, বোঝেনি যে কর্তৃত্বমূলক সংগ্রামের প্রস্তুতি যুদ্ধ, আন্দোলন বা সেনা-সন্নিবেশের প্রস্তুতি থেকে আলাদা, এবং এই প্রস্তুতি নিতে হয় যতটা না সংগঠনের স্তরে তার চেয়ে বেশী নৈতিক ও মতাদর্শগত স্তরে, কেবল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগণ ও ক্যাডারদের একটি সুশৃঙ্খল জনসমষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া। এবং ১৯৩৭-৪১-এর গোটা সময়টা জুড়ে গান্ধীর দুটি প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল কংগ্রেস সংগঠনে দুর্নীতি ও শৃঙ্খলার অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে হিন্দু ও মুসলিম জনগণের একতা আনা। এটাই ছিল তার 'সংগ্রামের প্রস্তুতির' পদ্ধতি।

৩৪. উদাহরণস্বরূপ উমাশঙ্কর যোশী (গুজরাট), শিব ভার্মা (উত্তর প্রদেশ), ডি. কে. কুন্তে (মহারাষ্ট্র), এ. কে. রমন কুট্টি (পালঘাট), শ্রীরাম শর্মা (পাঞ্জাব-হরিয়ানা), কে. লিঙ্গরাজ (অন্ধ্র) এবং পোপতলাল সাহ (পুনে)-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। শশী যোশী নীচুতলার কর্মীদের স্বকীয়ত্ব ও উদ্ভাবনীশক্তির অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন। দেখুন, শশী যোশী, "দা লেফ্‌ট অ্যান্ড দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, ১৯২০-৩৪", পি. এইচ. ডি. থিসিস।

৫

মতাদর্শগত পরিবর্তন

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী গতিপ্রকৃতির একটি প্রধান দিক ছিল জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসকে একটি বামপন্থী, সমাজবাদী দিক অভিমুখে মোড় নেওয়ানোর জন্য জওহরলাল নেহরু, কংগ্রেস সমাজবাদী, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সমাজবাদী মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের সংগ্রাম। কিন্তু এই সংগ্রামের ক্ষেত্র কী হবে? এটা ছিল একটা মৌলিক প্রশ্ন, কারণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রধান দ্বন্দ্বের কোন শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে নিষ্পত্তি ঘটবে, অর্থাৎ স্বাধীনতার পর কী রকম ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটবে এই প্রশ্ন তা ঠিক করতে সাহায্য করতো।

হয়তো শুরুতেই এটা আলোচনা করলে সুবিধা হবে যে, যে বিশেষ, ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট আন্দোলনকে পরিবর্তন করতে চাওয়া হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগ্রামের ক্ষেত্র কী হতে পারতো না বা হওয়া উচিত ছিল না।

এটা একটা বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের, বা একটা বুর্জোয়া দল, জাতীয় কংগ্রেসের, শ্রেণী চরিত্র, শ্রেণীমূলকে পরিবর্তন করার, অর্থাৎ, তাকে বুর্জোয়া থেকে শ্রমিক বা কৃষকের জাতীয় আন্দোলন বা দলে পরিণত করার বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বে বা অধীনে অন্য সমস্ত ঔপনিবেশিকতা বিরোধী শ্রেণী ও স্তরের আন্দোলন থেকে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্বে বা অধীনে একটি আন্দোলনে পরিণত করার প্রশ্ন ছিল না।[১] ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন, যার প্রাথমিক দ্বন্দ্ব হ'ল সমগ্র সমাজের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার, এমন একটি আন্দোলন হিসাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল একটি জনপ্রিয়, জনগণের আন্দোলন, একটি বহু-শ্রেণীভিত্তিক গণ আন্দোলন যা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণী ও স্তরের প্রতিনিধিত্ব করতো। সুতরাং তার কোনো বিশেষ,

পূর্ব-নির্ধারিত আবশ্যিক বা অনিবার্য বা অপরিবর্তনীয় শ্রেণী চরিত্র বা 'শ্রেণীগুলির সঙ্গে সরাসরি বা আবশ্যিক সম্পর্ক" থাকার দরকার ছিল না।[২]

সামাজিক বা শ্রেণীগত শূণ্যতার মধ্যে উদ্ভূত না হলেও বা কাজ না করলেও, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদের কোনো বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বন্ধন থাকার দরকার নেই, কারণ তা সমগ্র ঔপনিবেশিক সমাজের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার প্রাথমিক দ্বন্দ্বের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, এটা মনে করা ভুল হবে যে একটি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় আন্দোলন কার্যত কেবল একটি শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে (বা অবশ্যই তা করা উচিত) এবং অন্য শ্রেণীর বা শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে যায় বা তাদের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে না। এই ধারণাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা যায় না যখন একটি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী বা জাতীয় আন্দোলন গণভিত্তি অর্জন করেছে।

একথা বলা হচ্ছে না যে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের কোনো শ্রেণীগত ফলাফল নেই। শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীরা তাতে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে কিনা, এটা অবশ্যই জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণীগত ফলাফল নির্ভর করে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শক্তিগুলির পরিবর্তনশীল ভারসাম্যের উপর এবং বিশেষত স্বাধীনতার মুহূর্তে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীর আন্দোলনে অংশগ্রহণের ভার, ব্যাপকতা ও ধরণের উপর।[৩] জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থী ধারার একটি কাজ হ'ল এই ভারসাম্য যাতে শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি ও ধারাগুলির পক্ষে থাকে. সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির ও ধনবাদের পক্ষে নয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা। ঐতিহাসিকেরও কাজ জাতীয় আন্দোলনের উপর একটি অনৈতিহাসিক শ্রেণী চরিত্র চাপিয়ে দেওয়া নয়, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক আন্দোলনের যার লক্ষ্য অবশ্যই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে উৎখাত করা, তার বিকাশ ধারার মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শক্তিগুলির প্রকৃত, পরিবর্তনশীল ভারসাম্যকে অধ্যয়ন করা।

অবশ্যই, আমরা তাদের সঙ্গে একেবারেই একমত হতে পারি না যারা জাতীয়তাবাদকে বুর্জোয়া মতাদর্শের সঙ্গে এক করে ফেলেন এবং মনে করেন যে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ মাত্রেই চরিত্রের দিক থেকে পাকা বুর্জোয়া ; কেবল ধনিক শ্রেণীর সঙ্গেই এর সম্পর্ক রয়েছে ; এবং মূল চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দরুণ তা কেবল, বুর্জোয়া শ্রেণীরই স্বার্থরক্ষা করতে পারে ;[৪] জাতীয়তাবাদ কেবল বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষেত্রেই একটি প্রকৃত মতাদর্শ হতে পারে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে তা মিথ্যা চেতনা ; সুতরাং, একটি দেশ বা উপনিবেশকে ঐক্যবদ্ধ বা মুক্ত করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকরা বুর্জোয়াদের

সমর্থন করতে পারে বা তাদের সঙ্গে ঐক্য গড়তে পারে. কিন্তু তাদের নিজেদের মতাদর্শ কখনোই জাতীয়তাবাদ হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয় এবং তাদের কোনো অবস্থাতেই জাতীয়তাবাদকে আত্মস্থ করা উচিত নয় এবং সমাজবাদই কেবল—অন্তত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে—তাদের নিজস্ব মতাদর্শ হতে পারে, কারণ জাতীয়তাবাদ কেবল বুর্জোয়াদেরই মতাদর্শ হয় এবং হতে পারে।

যাইহোক, ঔপনিবেশিকতার **বিরুদ্ধে** এবং ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের **মধ্যে** ঐক্যবদ্ধ জনগণ শ্রেণীবিভক্তও বটে। একটি গণ আন্দোলন বা জনপ্রিয় আন্দোলনে এই বিভাজনের প্রতিফলন ঘটে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে। একটি জনপ্রিয়, গণ-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একাধিক সামাজিক মতাদর্শ কাজ করে ও সহাবস্থান করে। এবং বিভিন্ন দিক থেকে, ও কখনো সার্বিক-ভাবে, কিন্তু মতাদর্শগত উপাদান বা একটি সর্বাঙ্গীন মতাদর্শ ঔপনিবেশিক মতাদর্শগত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শগত কর্তৃত্বের সার্বিক ক্ষেত্রের ভিতর কর্তৃত্বমূলক অবস্থান থাকে। সমাজবাদী পরিবর্তনের প্রকল্পটি জনগণের শিবিরের মধ্যে মতাদর্শগত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মতাদর্শগত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে নয়।

এই দিকের সারসংকলন করে বলা যায়: জাতীয় আন্দোলনের পরি-বর্তনের প্রকল্পের, এবং এই প্রকল্পের অধ্যয়নের শুরুতেই এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে একটি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জনপ্রিয় গণ-আন্দোলন হিসাবে তাকে হ'তে হ'ত একটি বিশেষ শ্রেণী কর্তৃত্ব বা আবশ্যিক শ্রেণী চরিত্র রহিত এবং খোলামেলা। তাকে হ'তে হ'ত একটি বহু-শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন, কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর জোট নয়। তা জাতীয়, বা অন্য কোনো রকম, বুর্জোয়াদের, বা তাদের নেতৃত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন আন্দোলন ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত দল অথবা বুর্জোয়া ও জমিদারদের যুক্তফ্রন্ট ছিল না, তা ছিল কৃষক ও শ্রমিক, হস্তশিল্পী, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও জমিদারদের কিছু অংশ সমেত সমগ্র ভারতীয় জনগণের দল। জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, একটি উপনিবেশে কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতো না বা কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের প্রকাশ ছিল না। তা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমগ্র ঔপনিবেশিক সমাজের দ্বন্দ্বেরই প্রতিনিধিত্ব করতো। অন্যভাবে বললে, জাতীয় আন্দোলন বা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বুর্জোয়াদের বা বুর্জোয়া শ্রেণী কাঠামোর কোনো সরাসরি বা আবশ্যিক বা অনিবার্য সম্পর্ক ছিল না।

দুই

আমাদের মতে, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের রণনীতি, সংগ্রামের রূপ, আন্দোলনের গণ-চরিত্র, জঙ্গীভাব ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্রের ক্ষেত্রের ওপর দাঁড়িয়ে এই পরিবর্তনকে চিহ্নিত করারও কোনো কারণ ছিল না। রণনীতি ও আন্দোলন ও সংগঠনের রূপের, আমাদের মতে, কোনো শ্রেণী চরিত্র নেই। ওপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে অহিংসার মতাদর্শ বা অহিংস সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, পিকেটিং, জনসভা, বেআইনী মিছিল, জাঠা, মোর্চা, ইত্যাদি অথবা সংগ্রাম-আপোষ-সংগ্রাম রণনীতি বিশেষ কোনো শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত ছিল না, তার মধ্যে বিশেষভাবে বুর্জোয়া কোনোকিছু ছিল না। বস্তুত, ভারতীয় বুর্জোয়ারা শ্রেণীগতভাবে জাতীয় আন্দোলনে গৃহীত অনেক ধরনের সংগ্রামের সঙ্গেই নিজেদের জড়ায়নি। খুব বেশী হলে তারা তহবিল সংগ্রহ ও হরতালে অংশ নিয়েছে, যা কোনো পর্যায়েই সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত হয়নি।[৫] কোনো দেশের বুর্জোয়ারাই হিংসাকে এরকমভাবে বর্জন করেনি বা অহিংসার প্রতি এত অনুরক্তি দেখায় নি। ঔপনিবেশিক ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে সংগ্রামের রূপগুলি অথবা সংগ্রাম-আপোষ-সংগ্রাম রণনীতি আবশ্যিকভাবে শ্রেষ্ঠ বা এমনকি যথেষ্ট ছিল কিনা এগুলির পরিবর্তে আরও ভালো কিছু গ্রহণ করা উচিত ছিল কিনা, এই প্রশ্ন সমাজবাদী বনাম ধনবাদী বা বাম বনাম ডান, এই প্রেক্ষিতে আলোচনা করার মতো নয়। তা সমাজবাদী পরিবর্তনের সঙ্গে নয়, জাতীয় আন্দোলন চালানোর ধরনের সঙ্গে সম্পর্কিত ; সমাজবাদী পরিবর্তনের জন্য রণনীতি ও সংগ্রামের রূপ পরিবর্তন আবশ্যক ছিল না। থাকলেও তার ভিত্তি ছিল আলাদা। বাম ও দক্ষিণপন্থীরা এই রণনীতিগত বিতর্কের যে কোনো পক্ষেই থাকতে পারতো এবং ছিল, তারা তাদের মতাদর্শের কোনো অদল-বদল না করেই নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনও করতে পারতো এবং করেছিল, যেমন ১৯৩৭ সালে নেহরু করেছিলেন। বাম-ডান বিভাজনের সঙ্গেও গণ-আন্দোলন হিসাবে জাতীয় আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক ছিল না—আন্দোলনের এই চরিত্রের প্রতি—অথবা তার রাজনৈতিক জঙ্গীভাবের প্রতি—দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের মতোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।[৬] কখন আরও জঙ্গী-রূপ বা বেআইনী গণ-আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে, বা বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে, এইসব প্রশ্নে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু অনেক সময় এইসব প্রশ্নে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের নিজেদের মধ্যেই মতান্তর ছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রতি আনুগত্যের মাত্রা নিয়েও, আমাদের বিশ্বাস, কোনো মতান্তর ছিল না।[৭] দক্ষিণপন্থীদের দক্ষিণপন্থাকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করা, বা তাদের সাম্রাজ্য-

বাদের সঙ্গে 'দরদস্তুর', 'সহায়তা' বা 'সমঝোতা' করার অথবা তার কাছে 'আত্মসমর্পণ' করার ঝোঁক ছিল বলে ধরে নেওয়ার থেকে গুরুতর ভ্রান্তি আর হ'তে পারে না। দক্ষিণপন্থীরা, বামপন্থীদের মতোই, ধারাবাহিক ও দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবন্ধ ছিল।

তিন

ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে গৌণ হিসাবে দেখা এবং সুতরাং জমিদার ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শ্রেণীযুদ্ধের বদলে শ্রেণী সমঝোতার ওকালতি ও অনুশীলন করার কংগ্রেস নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনকে বামমুখী করার ধারাটিকে যুক্ত বা চিহ্নিত করাও যায় না। আমাদের বিশ্বাস, ঔপনিবেশিক সমাজ ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে দুটি মূল ধারণাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে: (ক) সমাজ পরস্পর শ্রেণীসংগ্রামে যুযুধমান পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং (খ) ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব ও শোষণ থেকে যে প্রাথমিক দ্বন্দ্ব উঠে আসে, তা হ'ল ঔপনিবেশিক জনগণ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দুটি ধারণাকে একত্র করলে, তাদের আন্তঃসম্পর্ককে বুঝলে, এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামেরত ঔপনিবেশিক সমাজে শ্রেণী সমঝোতার গুরুত্ব অনুধাবন করলে, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রাম ও উপনিবেশের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকার অধ্যয়নে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ এবং অদ্যাবধি অবহেলিত চিত্তাকর্ষক দিক খুলে যায়। আমাদের তাই একটু দীর্ঘপথ পরিক্রমা করা দরকার।

শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী শোষণ থাকার দরুণ বামপন্থীদের একটি মূল কাজ ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী সংগঠনে সংগঠিত করা এবং তাদের কেন্দ্র করে জনপ্রিয় সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের শ্রেণীগত দাবীগুলির জন্য লড়াই করা। একই সঙ্গে, প্রাথমিক দ্বন্দ্বের প্রাথমিকতার অর্থ হ'ল এই, যে ভারতীয় শোষক ও শোষিতরা ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে একই শিবিরের সদস্য ছিল। স্পষ্টতই, আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্বকে দেখতে হ'ত গৌণ হিসাবে, সুতরাং তা ছিল প্রাথমিক দ্বন্দ্বের অধীনস্থ; তাকে দেখতে হ'ত জনগণের শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসাবে, এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে গড়ে তুলতে হ'ত অবৈরভাবে। তার মানে ভারতীয় সমাজের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামকে তার চূড়ান্ত সীমায় ঠেলে দেওয়া যেত না। **তার অর্থ, পারস্পরিক বৈরভাবাপন্ন ভারতীয় সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে শ্রেণী সমঝোতা করতেই হ'ত।** যদিও কংগ্রেস, এবং বিশেষত গান্ধী, শ্রেণী সমঝোতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন[৮], কোনো ভারতীয় নেতা, এমনকি গান্ধীও, তাকে তত্ত্বায়িত করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের মার্কসবাদী নেতারা, কেবল তা অনুসরণ করেন নি, ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত বিশদ কর্মসূচী আকারে তা রেখেছিলেন। তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের সমস্ত পারস্পরিক বৈরভাবাপন্ন শ্রেণীগুলির পরস্পরকে ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামকে খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার। এ বিষয়ে ধ্রুপদী মার্কসবাদী অবস্থান, যদিও মার্কস ও এঙ্গেলস তার গোড়াপত্তন করেছিলেন[৯], পুরোপুরি বিকশিত হয়েছিল চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সময়ে মাও সে তুঙ-এর হাতে।[১০]

> শ্রেণী সংগ্রামকে, জাপানকে প্রতিরোধ করতে, বর্তমান জাতীয় সংগ্রামের অধীনস্থ করাই হ'ল যুক্তফ্রণ্টের মূলনীতি। ···বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত একটি দেশে শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামের রূপ নেয়, যা এই দুইয়ের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেয়। একদিকে, জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক পর্যায়ে শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীগুলি এই শ্রেণীগুলির মধ্যে সহায়তাকে ভেঙে না দেওয়ার শর্তের ওপর দাঁড় করাতে হবে; অন্যদিকে, শ্রেণী সংগ্রামের সমস্ত দাবীগুলি জাতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনের জায়গা থেকে শুরু করতে হবে।

এবং আবার :[১১]

> এটা একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি, যে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সবকিছুকে জাপানকে প্রতিরোধ করার স্বার্থের অধীনস্থ হ'তে হবে। সুতরাং শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থকে প্রতিরোধ সংগ্রামের স্বার্থের অধীনস্থ হ'তে হবে, বিরোধী নয়। কিন্তু শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে। **আমরা শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করি না, তাকে খাপ খাইয়ে নিই।** ··· জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের একটি উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে শ্রেণী সম্পর্কগুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

শ্রেণী সমঝোতা বলতে মাও কী বুঝিয়েছেন তা তিনি ব্যাখ্যাও করেছেন :[১২]

> শ্রমিকরা দাবী করবে যে ফ্যাক্টরী মালিকরা তাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি করুক, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সুবিধার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে; জমিদারদের খাজনা ও সুদ কমাতে হবে, কিন্তু একই সঙ্গে কৃষকদের জমিদারদের খাজনা ও সুদ দিতে হবে এবং বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরাও একইভাবে শ্রেণী সমঝোতার অনুসরণ করেছিল ও তার বিষয়ে লিখেছিল।[১৩] চিত্তাকর্ষকভাবে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও জনযুদ্ধের পর্যায়ে শ্রেণী সমঝোতা করেছিল, যখন তারা বিশ্বস্তরে ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামে প্রাথমিক দ্বন্দ্বটি আবিষ্কার করেছিল।[১৪] উপরন্তু, মাও এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যা করেন নি, সি. পি. আই. শ্রেণী সংগ্রামকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল অভিজ্ঞতাবাদী ধরণে, প্রাথমিক ও গৌণ, অথবা বৈর ও অবৈর দ্বন্দ্বের সম্পর্কের সূত্রে তার তত্ত্বায়ন না করেই। আমরা আরও লক্ষ্য করতে পারি, যে সহজানন্দ সরস্বতী, যিনি ১৯৩৭-৩৯-এ কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে তিলমাত্র ছাড় দিতে বা তার সঙ্গে কোনোরকমভাবে মানিয়ে নিতে রাজী ছিলেন না, তিনিই ১৯৪২-৪৪-এ প্রকাশ্যেই কৃষকদের বলেছিলেন জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করতে।

শ্রেণী সমঝোতা, যা ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ভাবধারার অংশ হ'তে বাধ্য, মূল বিচার্য বিষয় ছিল না, কীভাবে তা করা হবে এবং ঔপনিবেশিক সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামকে কীভাবে দেখা ও স্থান দেওয়া হবে, তাই ছিল মূল বিচার্য বিষয়। শ্রেণী সমঝোতার অন্তর্নিহিত মতাদর্শও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রেণী সমঝোতাকে অপরিবর্তনীয় হিসাবে দেখাও ঠিক নয়। তার সীমারেখা ও শর্তগুলিকে দেখতে হবে সচেতন চেষ্টার দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রূপে। উদাহরণ-স্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে, প্রথমে সমঝোতার ক্ষেত্রে ছিল বেগার প্রথা ও উচ্ছেদ বন্ধ করা, তারপর খাজনা কমানো তার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং শেষে এমনকি জমিদারী প্রথার অবসানও জমিদারদের প্রতি ছাড়ের রূপ নিয়ে সমঝোতার মুখোমুখি হয়।

শ্রেণী সমঝোতার শর্তগুলি নির্ভর করবে কৃষকদের চেতনা, আন্দোলনে এগিয়ে আসা, সংগঠন ও সংগ্রামের স্তরের ওপর, এবং সার্বিকভাবে আন্দোলন কতটা বামমুখী হচ্ছে তার ওপর। অন্যভাবে বললে, দক্ষিণপন্থীরা যখন শোষিত শ্রেণীগুলির সংগঠিত হওয়ার বা তাদের শ্রেণীগত দাবীতে শ্রেণী সংগ্রামের বা শ্রেণী সংগ্রামের মতাদর্শের বিরোধীতা করবে তখন তাদের সমালোচনা বা বিরোধিতা করতে হবে, কিন্তু যখন তারা শ্রেণী সমঝোতার বা ভারতীয় জনগণের ব্যাপক ঐক্যের পরিসীমার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামকে সীমিত রাখার কথা, বলে, তখন নয়।

চিত্তাকর্ষকভাবে, ১৯৩১-এ করাচীতে এবং তারপর দক্ষিণপন্থীরা ভারতীয় জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠনে সংগঠিত করায় রাজী হয়েছিল, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভা—এমনকি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা বিদেশী শিল্পের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের মতো করে তাদের সংগঠিতও করেছিল। এমনকি আভ্যন্তরীণ শোষকদের বিরুদ্ধেও শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণীগত

দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলায় তারা আপত্তি করেনি।[১৫] কিন্তু তারা নির্দিষ্টভাবে বলেছিল যে শ্রেণী সংগ্রামকে অবৈরভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং চালাতে হবে, সুতরাং আভ্যন্তরীণ শোষকদের বিরুদ্ধে শারীরিক হিংসা বা তাদের শ্রেণীগত অস্তিত্বনাশ দাবী করার জায়গায় না গিয়েই তা করতে হবে। ফলত তারা করাচী ও ফৈজপুরে গৃহীত কংগ্রেস কর্মসূচীতে এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে ক্রমবর্ধমান হারে র‍্যাডিকাল, যদিও খাপ খাইয়ে নেওয়া, শ্রেণীগত দাবী—শ্রেণী শোষণ ও শোষকদের বিনাশের নীচের স্তরে—রাখতে রাজী হয়েছিল, অবশ্য অনেক সময় বামপন্থীদের চাপে পড়ে। তারা ১৯৩৬-৩৮-এ কংগ্রেসের সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের সমর্থকদের রাখতেও রাজী হয়েছিল।[১৬] আমরা যদি সময়সীমার কথা মনে রাখি, কৃষিক্ষেত্রে ও অন্যান্য সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের দিকে শ্রেণী-ভারসাম্যকে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি বেশ র‍্যাডিকাল কাজ করেছিল। এমনকি অধিক রক্ষণশীল বিহারেও আইন করার ফলে জমির খাজনা ২৫ শতাংশ কমে গিয়েছিল।[১৭] উত্তরপ্রদেশে ১৯৩১-এর মে মাসে ঘোষিত গান্ধীর ইস্তাহার 'কৃষকদের প্রতি' হ'ল শ্রেণী সমঝোতার একটি ভালো উদাহরণ। এই ইস্তাহারে কৃষকদের কেবল ৭৫ বা ৫০ শতাংশ খাজনা দিতে বলা হয়েছিল। তাতেও অসমর্থ হ'লে তারা খাজনা আরও কমিয়ে দিতে পারতো:[১৮]

> কংগ্রেস আশা করে যে প্রত্যেক প্রজা যত শীঘ্র সম্ভব সে যতটা খাজনা পারবে দিয়ে দেবে, যা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে ৮ আনা বা ১২ আনার কম হবে না। কিন্তু যেমন একই জেলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক খাজনা দেওয়া সম্ভব, তেমনি এটাও সমানভাবে সম্ভব যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮ আনা বা ১২ আনার কমই দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, আমি আশা করবো যে জমিদাররা কৃষকদের প্রতি উদার আচরণ করবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আপনারা দেখবেন যেন টাকা দেওয়া হলে আপনারা বর্তমান বছরের খাজনার দায় থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পান।

কৃষিক্ষেত্রে র‍্যাডিকালিজম, শ্রেণী সমঝোতা ও ঔপনিবেশিকতবাদ বিরোধিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যা ধারণার দিক থেকে কার্যত মাও-এর মতোই ছিল, ৪ অগাস্ট ১৯৪২-এ গান্ধী কর্তৃক রচিত এবং ৮ অগাস্ট ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচিত অহিংস প্রতিরোধকারীদের জন্য খসড়া নির্দেশাবলী। "কংগ্রেস মনে করে যে জমিতে যে কাজ করে জমি তারই, আর কারও নয়". একথা বলার পর নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে যে কোনো জমিদার জমির ট্যাক্স

না দেওয়ার আন্দোলনে রায়তদের সঙ্গে যোগ দিলে তাকে তার প্রাপ্য রাজস্বের অংশটুকু মিটিয়ে দিতে হবে, কিন্তু সরকারের পক্ষ নিলে "তাকে কোনো ট্যাক্স দেওয়া চলবে না।"[১৯] মাও-এর 'দেশপ্রেমিক জমিদার'-এর প্রতিধ্বনি !

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার অবসানের কোনো নির্দিষ্ট দাবী ছিল না। আবারও ভুলভাবে, যারাই এই দাবীর বিরোধীতা করেছে তারাই দক্ষিণপন্থী, এভাবে দেখা হয়েছে। চীনের মতো আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলিতে, যেখানে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীগুলি, বিশেষত জমিদার ও মুৎসুদ্দিরা, রাষ্ট্রক্ষমতার অংশ নেয় ও অনেকক্ষেত্রে তা ব্যবহার করে, সেখানে সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য বদলায়। কখনো সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং জমিদারী প্রথার বিনাশের জন্য সংগ্রাম মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, কারণ, শত্রু হিসাবে থাকা সত্ত্বেও, ঔপনিবেশিকতা জনজাগরণের জন্য আশু ও প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনের এবং রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সংগ্রামের **লক্ষ্য হয়না** এবং **হতে পারেনা**। এর উদাহরণ হ'ল ১৯২২ থেকে ১৯৩৪-এর চীনের সংগ্রাম, যার সরাসরি লক্ষ্য ছিল সমরনায়করা, যাদের সামাজিক ভিত্তি ছিল জমিদারদের মধ্যে, এবং ১৯৪৬-৪৯-এর গৃহযুদ্ধ, যার লক্ষ্য ছিল চিয়াং কাই-শেক-এর ক্ষমতাকে উৎখাত করা। উভয় ক্ষেত্রেই, কৃষিবিপ্লব ছিল কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিকতা যখন সরাসরি শাসন করে বা ভয় দেখায়, গণ-আন্দোলনের আশু লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা হবু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, এবং জমিদারী প্রথার বিনাশের সংগ্রামকে হয় চালানো হয়না, নয় পরিত্যাগ করা হয়। এটাই হয়েছিল ১৯১৮-১৯ ও ১৯৩৭-৪৫-এ চীনের, এবং ১৯৩৯-এর পর ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে।

ভারতে ঔপনিবেশিকতা সরাসরি শাসন করছিল; কোনো ভারতীয় সামাজিক শ্রেণী রাষ্ট্র-ক্ষমতার অংশীদার ছিল না।[২০] সুতরাং, আশু স্লোগান হিসাবে সামন্তবাদের বিনাশ বা কৃষিবিপ্লব কোনো সময়েই গ্রহণ-যোগ্য ছিল না: তা কেবল দীর্ঘকালীন লক্ষ্যই হ'তে পারতো। ইয়োরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তরের বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করা; ভারতে অনুরূপ পর্যায়টির লক্ষ্য হয়েছিল ঔপনিবেশিকতার অবসান। ঔপ-নিবেশিকতা বিরোধী বিপ্লব ও কৃষিবিপ্লবকে মিশিয়ে ফেললে যে ব্যঞ্জন তৈরী হয়, তা জাতীয় আন্দোলন বা বামপন্থীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। এবং আমরা আগেই দেখিয়েছি যে দক্ষিণপন্থীরা জমিদারী প্রথা (ও মহাজনী)-কে বিনাশ না করতে চাইলেও তার বিরুদ্ধে অনেক দূর যেতে রাজী ছিল।

চার

আমাদের মতে সমাজবাদের দিকে জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেসের পরিবর্তনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল নৈতিক ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্র সহ মতাদর্শগত ক্ষেত্র। ১৮৮০-এর দশক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বাধীন আধুনিক অর্থনৈতিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্রের এক নির্ভুল সমালোচনার ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিকাশের প্রেক্ষাপট অবশ্য অনেকটাই বুর্জোয়া সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, অথবা স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশকে দেখা হয়েছিল ধনবাদী কাঠামোর মধ্যে। তাই আমরা এই আন্দোলনকে বা কংগ্রেসকে বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্ব বা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক মতাদর্শগত কর্তৃত্বের অধীনে একটি জনপ্রিয় আন্দোলন বা গণ-আন্দোলন রূপে চরিত্রায়িত করতে পারি।[২১] ১৯১৯-এর পর, যখন জাতীয় আন্দোলন গণ আন্দোলন হয়ে ওঠে, গান্ধী একটি ভিন্নতর, অ-ধনবাদী, মূলত কৃষক-হস্তশিল্পীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নেন ও প্রচার করেন, কিন্তু তাঁর সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী বা অর্থনৈতিক চিন্তা বুর্জোয়া মতাদর্শের মূল কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে সমর্থ ছিল না।

সুতরাং মুক্ত ভারত নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের সমাজবীক্ষা বা বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্বকেই বামপন্থীদের ক্রমাগত ও তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তিত করতে হ'ত। ব্যাপারটা অন্যরকমভাবেও উপস্থিত করা যায়। এখানে প্রশ্নটা ছিল কেউ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী না প্রলেতারীয় জাতীয়তাবাদী হবে তা নয়; প্রশ্নটা ছিল একজন জাতীয়তাবাদী হবে সামাজিক বিকাশের বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, না সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। অবশ্যই, একটি জনপ্রিয়, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী গণ-আন্দোলনে সংগ্রামের ক্ষেত্রটা মতাদর্শগত হওয়ার বিশেষ কিছু গুরুত্ব রয়েছে। এই প্রচেষ্টা বা সংগ্রামের লক্ষ্য হ'তে হ'ত সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে এবং সর্বোপরি কংগ্রেসের মধ্যে বা উপরে সমাজবাদী ধ্যান-ধারণার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। প্রকল্পটি কেবল শ্রমিকশ্রেণী এবং দরিদ্র ও মধ্য কৃষকদের দলে নিয়ে আসার, বা কংগ্রেসকে একটি শ্রমিকশ্রেণীর দলে পরিণত করার, বা যেসব শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্বকারী দল ইতিমধ্যেই বিদ্যমান, তাদের মধ্যে শ্রেণী-জোট গড়ে তোলার, বা কংগ্রেসের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার, বা বিভিন্ন স্তরে তার নেতৃত্বকে কুক্ষিগত করার ছিল না। সমাজবাদী বিকল্পকে আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর বা শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার আকারে নয়, শ্রেণীগত বিকল্পের আকারে নয়, মতাদর্শগত আকারে, অর্থাৎ নৈতিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের বিকল্পের আকারে তুলে ধরতে হ'ত। কাজটা ছিল আন্দোলনকে একটি নতুন সমাজবাদী মতাদর্শগত

দিক নির্দেশ দেওয়া, বিদ্যমান জাতীয় আন্দোলন বা গান্ধীর নেতৃত্বের বিকল্প সৃষ্টি করার জন্য লড়াই করা নয়।

কথাবার্তা এবং লেখায় ধৈর্যশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে যুক্তি দিয়ে ও বুঝিয়ে, এবং কার্যক্ষেত্রের উদাহরণ দেখিয়ে, সমস্ত রঙের ও সমাজের সকল অংশের জাতীয়তাবাদীদের, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের, একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক লক্ষ্য হিসাবে সমাজবাদে দীক্ষিত করে তুলতে হ'ত; এবং এই কাজ খুব কঠিন ছিল না কারণ তারা ইতিমধ্যেই ব্যাপকতর সামাজিক আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে নির্দেশিত ও দায়বদ্ধ ছিল।[২২] পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম মূলত যৌথ মালিকানাভুক্ত শ্রেণীর দাবী ও স্বার্থকে কেন্দ্র করে রচিত হয়নি, কিন্তু সামাজিক লক্ষ্যগুলি, বিশেষত ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শকে কেন্দ্র করে হয়েছে—যদিও এই সংগ্রামকে তাদের কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে শ্রেণীগত কাজের অংশ হিসাবে গড়ে তুলতে হ'ত। জাতীয়তাবাদী কর্মীরা যে সামাজিক মতাদর্শ দিনের পর দিন প্রচার করছিল এবং তার ওপর জনপ্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তাকে প্রভাবিত করাই ছিল মূল কাজ। কোন নেতা বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে তা নির্ধারণ করতে মনোনিবেশ করা নয়. যারা একে খোলামেলাভাবে গ্রহণ করবে তাদের সবার কাছে সমাজবাদী ধ্যান-ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল আসল কাজ। একটি সুপরিকল্পিত ছক অনুসারে আকাশ থেকে বা 'রেডিমেড' র‍্যাডিকাল শক্তির উদয়ের আশায় বসে থাকা নয়, বিদ্যমান র‍্যাডিকালিজম্‌ বা ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত র‍্যাডিকাল শক্তি ও ধারাগুলিকে আত্মগত ও আরও বিকশিত করা যতক্ষণ না তারা একটি গুণগত উল্লম্ফনের জন্য প্রস্তুত হয়—যেমন ঘটেছে কিউবায়, নিকারাগুয়ায়, আফ্রিকার পর্তুগীস উপনিবেশগুলিতে, এবং সর্বোপরি চীনে ৪ঠা মে-র আন্দোলন, সান ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিনটাং এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে)। কাজটা ছিল বিদ্যমান শক্তিগুলির ভিতর র‍্যাডিকালদের দিকে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা।[২৩]

আধুনিকতর পরিভাষায়, মতাদর্শগত পরিবর্তনের অর্থ ছিল বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী সমীক্ষণের ভারসাম্যকে পরিবর্তন করা।[২৪] এটাও বোঝার প্রয়োজন ছিল যে একটি আন্দোলন বা কংগ্রেসের মতো একটি সংগঠনের পরিবর্তন একটি ঘটনা নয়. প্রক্রিয়া, এবং একটি প্রক্রিয়া হিসাবে তাকে ধাপে ধাপে বিকশিত হ'তে হবে। আমরা দেখতে পারি যে তার পরিবর্তনের অংশ হিসাবে কংগ্রেস ক্রমেই অধিকতর র‍্যাডিকাল সামাজিক দিশায় বিবর্তিত হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ক্রমবর্ধমান হারে বামপন্থীদের বেশীরভাগ দাবী মেনে নিয়েছিল। এই বিবর্তনে অবশ্যই বামপন্থী

রাজনীতি এবং শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরিবর্তনের কাজে সফলভাবে হাত দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিদ্যমান জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কে একটি নির্ভুল ধারণা এবং তার সঙ্গে একটি নির্ভুল সম্পর্ক গড়ে তোলাও দরকার ছিল।[২৫]

সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রাধান্যের আরও একটা দিক ছিল। যেহেতু কোনো ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের পক্ষেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের দাবী তোলা সম্ভব ছিল না, তাই সমাজবাদী প্রকল্পটিকেও কেবল মতাদর্শগত ক্ষেত্র ছাড়া কর্মসূচীর রূপ দেওয়া যেত না। একটি বহুশ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন কেবল এক সমাজবাদী বীক্ষণকে গ্রহণ করতে পারতো, কোনো আশু প্রলেতারীয় শ্রেণী কর্মসূচীকে নয়—তা করতে গেলে স্তরগুলিকে গুলিয়ে ফেলা হ'ত। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসন ছিল, ততক্ষণ সমাজবাদের রূপায়ণের জন্য কোনো সংগ্রাম সম্ভব ছিল না, কেবল সমাজবাদী মতাদর্শের প্রসার এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শগত পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম হ'তে পারতো।

পাঁচ

আমাদের বিশ্বাস, তাদের বিদ্যমান মতাদর্শের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় আন্দোলন, ও জাতীয় কংগ্রেস, যা তা তাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, একটি সমাজবাদী প্রেক্ষাপট বা বীক্ষণের দিকে পরিবর্তনের প্রতি উন্মুক্ত ছিল। এই সম্ভাবনা ছিল পরিস্থিতি ও আন্দোলনের একাধিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ।

(১) একটি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী গণ-আন্দোলন হওয়ার কারণেই জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র ছিল খোলামেলা; তার ওপর কোনো একটি শ্রেণীর শ্রেণীগত কর্তৃত্ব ছিল না।[২৬] বিশেষভাবে, যেহেতু এর শ্রেণীগত অন্তর্বস্তু বা শ্রেণীচরিত্র সরাসরি শ্রেণী আধিপত্য বা শ্রেণী নেতৃত্বের রূপ না নিয়ে মতাদর্শগত কর্তৃত্বের রূপ নিয়েছিল, সেহেতু তার মতাদর্শগত পরিবর্তন বা একটি মতাদর্শগত কর্তৃত্বের দ্বারা অন্য একটির প্রতিস্থাপনের প্রতি উন্মুক্ত ছিল। উপরন্তু, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীরা একটি প্রশস্ত মতাদর্শগত বর্ণালীর অংশ ছিল, তার উৎসবিন্দু নয়। এই দিক থেকে, কংগ্রেসের বেশী মিল ছিল ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে, যা তারই মতো বুর্জোয়া পার্টি বা বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন পার্টি ছিল না। তা ছিল বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্বাধীন একটি পার্টি।[২৭] তাই অতি র‍্যাডিকাল ও সমাজবাদের প্রতি পুরোপুরি কমিটেড মার্কসবাদীদের পক্ষেও তাতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তারা বহুকাল ধরেই এটা করে এসেছে এবং এখনও করে চলেছে, এই বিশ্বাস থেকে নয় যে এটা একটা সমাজবাদী দল, বরং এই

ভিত্তিতে যে এর মধ্যে সমাজবাদী দিশায় পরিবর্তনের বা মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[২৮]

(২) মতাদর্শগত পরিবর্তন কংগ্রেসের পক্ষে কোনো নতুন অভিজ্ঞতা হ'ত না। ১৮৮০-র দশক থেকেই তার মধ্যে এরকম পরিবর্তন ও সংগ্রাম চলেছে। বস্তুত, এর প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল দাদাভাই নওরজীর নেতৃত্বে তরুণ জাতীয়তাবাদীদের ঔপনিবেশিকতা ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে মতাদর্শগত সিদ্ধান্তের ফল হিসাবে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলিতে ও ১৯২০-র দশকে এর ভিতরে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চলেছিল।

(৩) বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুণ যদিও বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্ব অনেক গভীরে শিকড় বিস্তার করেছিল এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল, তা খুব একটা সচেতনভাবে বা পুরোপুরিভাবে বা এমনকি দৃঢ়ভাবে শ্রেণীভিত্তির ওপর গড়ে ওঠেনি। তা কখনোই খুব 'কঠিন' ছিল না, অর্থাৎ কখনোই পুরোপুরি দানা বাঁধেনি। ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯১৭ তা গৃহীত হয়েছিল এবং সর্বময় কর্তৃত্ব চালিয়েছিল এই কারণে যে ভারতে বিকাশের অন্য কোনো পথের দিশা ছিল তুলনামূলকভাবে অনুপস্থিত বা দুর্বল, এই কারণে নয় যে গোড়ার যুগের নেতাদের ধনবাদ বা ধনীক শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য ছিল। নরমপন্থীদের স্বাধীন শিল্পবিকাশের ভারতীয় মাধ্যম খুঁজতে হয়েছিল, নাহলে তারা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সমালোচনাকে রূপ দিতে পারতো না, বিশেষত যখন ঔপনিবেশিক অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য তাত্ত্বিকরা ক্রমাগত দেখিয়ে যাচ্ছিল যে বিদেশী ধনিকরা ছাড়া আধুনিক শিল্পবিকাশের আর কোনো মাধ্যম তুলনামূলকভাবে অনুপস্থিত। এদের 'চিন্তাধারা' এবং বিকাশের বিকল্প ভারতীয় শ্রেণীমাধ্যম বা হাতিয়ার নির্দেশ করা ব্যতিরেকে তাদের সমালোচনা পুরোপুরি বিমূর্ত, সম্ভাব্যতাবর্জিত ও আবেদনবর্জিত হয়ে পড়তো, এবং সামাজিক শূন্যতায় নিরালম্ব অবস্থায় থাকতো। একটি দেশজ ধনীকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী না হ'লে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হ'তে হত; নাহলে আধুনিক শিল্পের সূত্রপাত হ'ত কী করে? আধুনিক শিল্প ছাড়া সমাজবাদের কথা ভাবা একেবারেই একটি বুদ্ধিজীবীসুলভ অবসর বিনোদন বা বিলাসিতা হ'ত। এবং নরমপন্থীরা কাজের লোক ছিল। এভাবেই নরমপন্থীরা—যারা ছিল তাদের যুগের র্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী—তাদের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী কর্মসূচী বা প্রকল্পের শ্রেণীগত বাহক বা মাধ্যম হিসাবে খুঁজে পেয়েছিল, এবং এই বিশ্বাস রেখেছিল, যে ভারতীয় মূলধনের স্বার্থ ও জাতির স্বার্থ মোটামুটি এক, যা সেই সময়ে ঠিকই ছিল। তাদের মতাদর্শগত সমীক্ষণের

প্রধান বিষয়গুলি ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতা বা জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ এবং গৌণ বিষয় ছিল বুর্জোয়া মতাদর্শ।[২৯] গান্ধী অবশ্য তা করেননি, কিন্তু যেহেতু তাঁর মূল মতাদর্শ তৈরী হয়েছিল ১৯১৭-র পূর্ববর্তী যুগে, তিনি অনৌপনিবেশিক বিকল্প অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য তাকিয়েছিলেন ক্ষুদ্র হস্তশিল্পী ও কৃষকসমাজের দিকে। এবং তিনি যখন আধুনিক বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখনও তিনি এই শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানা পছন্দ করেছিলেন।[৩০] কেবলমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক সমাজতন্ত্র, বিশেষত সোভিয়েত পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে তার বিকাশগত রূপ, দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক শিল্পবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাধ্যম ও পথের কথা নির্দিষ্টভাবে 'ভাবা' গিয়েছিল। ফলত, অক্টোবর বিপ্লবের পর যখন সমাজবাদী প্রেক্ষাপট পরিস্ফুট হ'ল এবং আধুনিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হ'ল, এই দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে কোনো দৃঢ় বৌদ্ধিক বাধা পায়নি এবং শুধু যে উদীয়মান বামপন্থীরা জাতীয় আন্দোলন ও তার মতাদর্শগত বর্ণালীর এক স্বীকৃত অংশ হয়ে দাঁড়ালো তাই নয়, সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত বিকশিত হ'ল এবং জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে অনেকেই তার দিকে ঝুঁকলো। জাতীয়তাবাদীদের কোনো উল্লেখযোগ্য ধারাই সমাজব্যবস্থা হিসাবে ধনবাদের স্বপক্ষে খুব জোর দিয়ে কিছু বলেনি। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে অ-শিল্পপতি সদস্যদের ব্যাপক অংশের ঝোঁক ছিল ধনবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজবাদের পক্ষে।

(৪) জন্ম থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলগতভাবে জনগণের এবং দরিদ্রদের পক্ষে ঝোঁক এবং এই ধারণা যে রাজনীতিকে হতে হবে জনগণের ওপর নির্ভরশীল, তাদের রাজনীতিসচেতন ও সক্রিয় করে তুলে রাজনীতিতে নিয়ে আসতে হবে, যা ওপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, এই আন্দোলনকে একটি সমাজবাদী দিশা দেওয়াকে আরও সহজ করে তুলেছিল।

কংগ্রেসের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক ছিল তার মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক উন্মুক্ততা। কোনো একটি শ্রেণী বা স্তরের নয়, সমগ্র ভারতীয় জনগণের ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে এর পক্ষে মতাদর্শগতভাবে সমসত্ব হওয়া সম্ভব ছিল না এবং হয়নি। এর মধ্যে ব্যাপকভাবে ভিন্ন মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ধারা ছিল, যারা সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য অবাধে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতো। কংগ্রেস তার সদস্য হওয়ার জন্য কোনোদিনই কোনো মতাদর্শগত শর্ত রাখেনি,[৩১] গান্ধীও তার ওপরে কোনো মতাদর্শগত বা নীতিগত একচেটিয়া অধিকার দাবী করেননি।[৩২] এমনকি যেসব মতাদর্শগত ধারা তাকে করায়ত্ব বা পরিবর্তিত করতে চেয়েছিল অথবা তার

বিকল্প হিসাবে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরও এর মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল ; কমিউনিস্ট সমাজবাদী ও রায়পন্থীরা যখন একই সঙ্গে কংগ্রেস বহিভূ'ত ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষান সভাগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করছিল, তখনও তাদের এর মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবী সন্ত্রাস-বাদীদের অনেকেই ছিল সক্রিয় কংগ্রেসকর্মী ও নেতা। কমিউনিস্টরা, উদাহরণস্বরূপ, কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করেছিল, তার সাংগঠনিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, অনেকসময় এ আই সি সি'র সদস্য হয়েছিল এবং জেলা ও রাজ্যস্তরে উচ্চপদ অধিকার করেছিল। কোনো সময়েই কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক বিক্ষোভকে অগণতান্ত্রিকভাবে দমন করা হয়নি। ১৯২৯ সালে তারা নিজেরাই কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যায় ; এবং তারা ইচ্ছে করলেই আবার ফিরে আসতে পারতো। ১৯৪৫-এর শেষদিকেই কেবল কমিউনিস্টদের কংগ্রেসে পদাধিকার করা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই কারণে নয় যে তারা শ্রমিকদের প্রতিনিধি বা মার্কসবাদী ছিল, বরং এই কারণে যে তারা তাদের দলের লাইন অনুযায়ী কংগ্রেসের গড়ে তোলা জীবন-মরণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে অস্বীকার করে, এমনকি তারা বিরোধিতা করে, আন্দোলনের শৃংখলা ভেঙেছিল। এবং এমনকি তখনও তাদের কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়নি।

(৫) আমরা আরও দেখতে পারি যে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব কোনো পর্যায়েই সমকালীন দক্ষিণপন্থী মতাদর্শকে রাস্তা ছেড়ে দেয় নি। তিলক ও অন্যান্য জাতীয় নেতাদের বেশিরভাগই ১৯১৭-র বিপ্লবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বদাই প্রশংসা ও সমর্থন করা হয়েছে। ইয়োরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বামপন্থী সাংস্কৃতিক ধারা-গুলির প্রভাব পড়তে দেরী হয় নি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২০-র দশকের শেষ ও ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে কংগ্রেস কর্মীরা গোর্কীর 'মা' ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তা ছিল সেই সময়কার একটি বহু পঠিত বই। নেতৃত্বের রং না দেখেই কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করেছে। মার্কসবাদ সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কোনো শক্তিশালী মার্কসবাদ বিরোধী বৌদ্ধিক ধারা গড়ে ওঠেনি। এটা চিত্তাকর্ষক যে, কোনো পর্যায়েই কংগ্রেসে মতাদর্শ নিয়ে কোনো ভাঙন আসেনি।

মতাদর্শগত উন্মুক্ততা কেবল কংগ্রেসের পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তাই নয়, এই বৈশিষ্ট্যই কংগ্রেসকে করে তুলেছিল সমস্ত ঔপনিবেশিকতা বিরোধী শ্রেণী ও শক্তির ঐতিহাসিক জোটের রাজনৈতিক প্রকাশ, যা আবার তাদের ভারতীয় জনগণরূপে এবং কংগ্রেসকে একটি জনপ্রিয় আন্দোলন রূপে গড়ে তুলেছিল। এই বৈশিষ্ট্য কংগ্রেসকে ঔপনিবেশিকতার

বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘস্থায়ী কর্তৃত্বমূলক ও গণভিত্তিক সংগ্রাম গড়ে তুলতেও সক্ষম করেছিল। অবশ্যই, এই ধরনের সংগ্রামের একটি প্রধান রণনীতিগত দিক হ'ল যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ন্যূনতম ঐকমত্য রয়েছে ততক্ষণ একটি সাধারণ লক্ষ্য এবং প্রাথমিক মূল্যবোধ সমন্বিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা।[৩৩]

(৬) বিকাশের বুর্জোয়া প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই আন্দোলন এবং কংগ্রেস ক্রমবর্ধমান হারে র‍্যাডিকাল সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মসূচী ও নীতি গ্রহণ করেছিল। অধ্যায় ২-তে তা দেখানো হয়েছে।

(৭) গান্ধীর মধ্যবর্তী, জনপ্রিয় মতাদর্শগত অবস্থান এবং জাতীয় আন্দোলনে তাঁর প্রাধান্য কংগ্রেসের সমাজবাদী মতাদর্শগত পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল। গান্ধী সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-সংগ্রামের ভূমিকাকে স্বীকার করতেন না; তিনি মার্কসবাদী অর্থে সমাজবাদীও ছিলেন না এবং একাধিকবার তিনি কমিউনিজম-এর বিরোধিতা করেছেন 'তার হিংসার জন্য'। কিন্তু তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সমাজ পরিবর্তনকামী। তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিদ্যমান ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন, যদিও তিনি তা ঘটাতে চেয়েছিলেন শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে এবং প্রকাশ্য শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াই। উপরন্তু, তিনি ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ক্রমশই এক র‍্যাডিকাল দিশায় অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার সার্বিক মতাদর্শগত কাঠামো এবং এই সময়ে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর অবস্থান থেকে এটা বলা যায় যে তিনি অবশ্যই বৌদ্ধিক ও মতাদর্শগত দিক দিয়ে বুর্জোয়া ছিলেন না[৩৪] এবং তাঁর অনেক মতাদর্শগত, কর্মসূচীগত ও নীতিগত অবস্থান বামপন্থীদের সঙ্গে মিলে যেত। অধ্যায় ২-তে আমরা তাঁর কৃষিক্ষেত্র সংক্রান্ত র‍্যাডিকালিজম্-এর উদাহরণ দিয়েছি। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন[৩৫] এবং বারবার বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের পক্ষে কথা বলেছিলেন। এইসব প্রশ্নে, ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত শোষণ এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর অবস্থান, তার সাধারণভাবে এবং মাঝে মাঝেই জনগণের স্ব-ক্রিয়তার এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সমতার ওপর, স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকদের ভূমিকার ওপর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, নারীদের সামাজিক মুক্তির পক্ষে এবং নাগরিক অধিকারের ওপর জোর দেওয়া, এবং সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁর সাধারণ সচেতনতা[৩৬] জাতীয় আন্দোলনের উপর বুর্জোয়া মতাদর্শের শক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠতে দেয়নি এবং দরিদ্রজনমুখী, সামাজিকভাবে প্রগতিশীল মতাদর্শের এবং গান্ধী, গান্ধীবাদী ও বামপন্থীদের সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমাগত সৃষ্টি করেছিল। এটাও মনে রাখা দরকার যে তাঁর আদর্শ

ও কাজ জনগণকে নিরস্ত্র বা নিষ্ক্রিয় করেনি ; উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করেছিল। উপরন্তু, গান্ধীর নিজের সার্বিক সামাজিক মতাদর্শ, তার মধ্যে সমস্ত র‍্যাডিকাল বিষয় বিদ্যমান থাকার দরুণ ও নীচুতলার, শোষিত, অধঃপতিত মানুষদের অভিমুখী হওয়ার দরুণ, বিকাশ এবং সমাজবাদের দিকে পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত ছিল, যদিও তিনি নিজে তাকে কোনো সঙ্গতিপূর্ণ সমাজবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর রূপ দেননি। যাই হোক, আমাদের বিশ্বাস, বামপন্থীদের গান্ধী, তাঁর চিন্তা ও গান্ধীবাদী কর্মীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং গান্ধী ও গান্ধীবাদীদের এবং তাদের লেখা ও সামাজিক কাজকর্মের মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজবাদী দিশা দেওয়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ছিল।

(৮) কংগ্রেসে বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্বের প্রতিনিধি ছিল এমন একদল দক্ষিণপন্থী, যারা তার সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে ও উচ্চস্তরে শক্তিশালী জায়গায় ছিল। কিন্তু এই দক্ষিণপন্থীদের মতাদর্শের অংশগুলির প্রণালী-বদ্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তা মতাদর্শগত স্তরে সমাজবাদী প্রকল্পের কাছে দৃঢ় বাধা ছিল না। প্রথমত, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ ছিল দৃঢ়-ভাবে জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আইন-বহির্ভূত গণ-আন্দোলন, নাগরিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রভিত্তিক রাজনীতি, স্বাধীন অর্থনীতি, বিদেশী পুঁজির বিরোধিতা ও একটি স্বাধীন ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির প্রতি দায়বদ্ধ, যা আগেই দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাদের সামাজিক মতাদর্শের দিক থেকে তারা বুর্জোয়া হলেও ছিল সংস্কারবাদী। উদাহরণস্বরূপ, তাদের কৃষি সংক্রান্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীর দিক থেকে, তারা ভূমি-মালিক কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতো, জমিদার, সামন্ত ও মহাজনদের নয়।[৩৭] স্থান-কালের গণ্ডী পেরিয়ে তুলনা হয়তো প্রবঞ্চনা করতে পারে, কিন্তু আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধ এবং সমাজবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধী হলেও, তাদের মতাদর্শগত ও কর্মসূচীগত অবস্থান ব্রিটেনের টোরিদের, জার্মানীর বিসমার্কপন্থী বা পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়াশীলদের, মেইজি জাপানের রূপকারদের, ঐক্য-পরবর্তী ইতালির কাভুর ও অন্যান্য নেতাদের বা আমেরিকার রিপাবলিকান ও ডিমক্র্যাটদের মতো ছিল না। অবশ্যই, তাদের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় দক্ষিণপন্থীদের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তারা উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনের র‍্যাডিকাল লিবারালদের অথবা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোগ্রেসিভদের থেকে বেশী র‍্যাডিকাল ছিল। তাদের অনেক বেশী মিল ছিল দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল ডিমক্র্যাট বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রুসভেল্ট-এর 'নিউ ডীল' পন্থীদের সঙ্গে। বস্তুত, এটা বলা যায় যে ইয়োরোপের মতো রক্ষণশীল ও দক্ষিণপন্থীরা ছিল কেবল কংগ্রেসের পরিসীমায় এবং লিবারাল ইত্যাদিদের মধ্যে, যারা কংগ্রেসের বাইরে কাজ করতো। অনুরূপভাবে, জমিদার ও সামন্তরা ব্যক্তিগতভাবে ছাড়া কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি, সমর্থন করেছে হয় আমন সভা বা ঐরকম সরকারী মদতপ্রাপ্ত সংগঠনকে, অথবা পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মাদ্রাজের মতো ক্ষেত্রে, তাদের নিজেদের রাজনৈতিক দলকে।

এর একটা ফল হয়েছিল এই, যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর নির্দিষ্ট বিষয়গুলি দক্ষিণপন্থীদের বেশিরভাগ নেতাই বামপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতায় অনেক দূর যেতে রাজী ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা শ্রেণী সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সীমার মধ্যে ছিল। আরেকটি ফল হয়েছিল যে তারা নেহরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের পাশাপাশি কাজ করতে রাজী ছিলেন।[৩৮]

(৯) নীচুতলার কংগ্রেস কর্মীদের বেশীরভাগই দায়বন্ধ সমাজবাদী বা মার্কসবাদী ছিল না, কিন্তু তারা মতাদর্শগতভাবে দক্ষিণপন্থীও ছিল না, এমনকি যখন তারা সাংগঠনিকভাবে কোনো না কোনো দক্ষিণপন্থী নেতার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তখনও। বস্তুত, আমাদের সাক্ষাৎকারগুলি দেখিয়ে দেয় যে ১৯২০, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ব্যাপক জনপ্রিয় দাবীভিত্তিক গণরাজনীতির ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদী কর্মীরা বেশী করে সমাজবাদী ধ্যানধারণা ও স্বাধীন ভারতের সমাজবাদী বীক্ষণের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। এটা গান্ধীবাদী কর্মীদের ক্ষেত্রেও সত্য, যাদের সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে অনেক মিল ছিল এবং যারা একটি সমাজবাদী ও সামন্তবাদ বিরোধী কর্মসূচীর দিকে ঝুঁকতো, যদি গান্ধীবাদী রণনীতি ও অহিংসার ওপর জোর দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা না হ'ত। এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা ছিল **দীর্ঘমেয়াদীভাবে** তৃণমূল স্তরের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ঝোঁক, যা ছিল নির্ধারক, ওয়র্কিং কমিটি বা প্রাদেশিক কমিটিগুলিতে যা ঘটতো তা নির্ধারক ছিল না। আমরা অধ্যায় ২তে দেখেছি যে কংগ্রেসের রাজনীতি ও কর্মসূচীতে এবং কংগ্রেস সংগঠনে সি এস পি ও সি পি আই-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে দিয়ে এই র‍্যাডিকালাইজেশন সেই সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিফলিত হয়েছে।

(১০) বামপন্থীদের অনুকূলে আরও কিছু ইতিবাচক বিষয় ছিল। জওহরলাল নেহরু, যিনি গান্ধীর পরেই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা

ছিলেন, তাঁর কিছু দুর্বলতা, যার মধ্যে প্রধান ছিল খানিকটা সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাব, বা হয়তো সাংগঠনিক কাজের জটিলতার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করার মানসিকতার অভাব সত্ত্বেও কর্মপন্থীদের একজন অসাধারণ নেতা ছিলেন। একজন মৌলিক চিন্তানায়ক না হলেও, তিনি ছিলেন এক শক্তিশালী গণসংযোগকারী, অদম্য বক্তা ও প্রচারক, জনপ্রিয়করণের কাজে সফল এবং যুবসমাজের নয়ণমণি। সর্বোপরি, কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের মতাদর্শগত পরিবর্তনের সমস্যাটির প্রতি তার ছিল এক মর্মগত নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী। সমগ্র ১৯৩০-এর দশক জুড়ে তিনি বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের অপর্যাপ্ততার এবং তার ওপর সম্পত্তিবান শ্রেণীদের কর্তৃত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং একটি নতুন সমাজবাদী বা মূলগতভাবে মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তার ওপর, যা জনগণকে তাদের অবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে, এবং কংগ্রেসকে একটি নতুন মতাদর্শগত দিশা দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। কংগ্রেসের মধ্যে অন্যান্যদের নতুন চিন্তাপদ্ধতির দিকে নিয়ে আসার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে লেখা তাঁর 'আত্মজীবনী'র একাধিক অধ্যায়ে গান্ধীর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু তার সুর মৃদু, বন্ধুত্বপূর্ণ, এমনকি সম্মানসূচক। একই সঙ্গে তিনি বামপন্থীদের বৈর সমালোচনার বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন এবং তাকে সমাজবাদী দিশা দেওয়ার এবং সমাজবাদী দিশায় পরিবর্তিত করার সম্ভাবনার ওপর জোর দিয়েছিলেন।[৩৯]

বামপন্থীরা তাদের নেতৃত্বে সর্বদিক থেকেই প্রতিভাবান ব্যক্তিদের নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল, এবং এমন সমস্ত কর্মীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল যারা ছিল তীক্ষ্ণধী, বিপুল সামর্থ ও সাহস, আনুগত্য, দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের চেতনার অধিকারী। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বামপন্থী নেতাদের তালিকায় আছেন জওহরলাল নেহরু, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ভগৎ সিং, সুভাষ বোস, এম. এন. রায়, এস. এ. ডাঙ্গে, পি. কৃষ্ণ পিল্লাই. পি. সুন্দরাইয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, জি. অধিকারী, অজয় ঘোষ, ভগৎ সিং বিলগা, সোহন সি যোশ, সোহন সিং বাখনা, তেজা সিং স্বতন্ত্র, আর. ডি. ভরদ্বাজ, পি সি. যোশী, ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, মুজাফ্ফর আহমদ, সাজ্জাদ জাহীর, জেড. এ. আহমেদ, বি. টি. রণদিভে, কে. এম. আশরাফ, কে. দামোদরন, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এন. জি. রঙ্গা, অরুণা আসফ আলী, সত্যবতী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুত পটবর্ধন, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, কার্যানন্দ শর্মা, এ. কে. গোপালন ও সমান ক্ষমতাসম্পন্ন অগণিত মানুষ।

ছয়

কংগ্রেসের মতাদর্শগত পরিবর্তনের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় ১৯২০-র দশকের শেষ ও ১৯৩০-এর দশকে, এবং বেশ দ্রুতই তা আংশিক সাফল্য লাভ করে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের ব্যাপক ও আশু প্রভাব পড়েছিল এবং ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে থেকে একটি বামপন্থী ধারা গড়ে উঠেছিল। ১৯২০-র দশকের শেষদিক থেকে শুরু করে, জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন আদিযুগের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীরা, জওহরলাল নেহরু, সুভাষ চন্দ্র বোস ও সমাজবাদী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা। ১৯৩০-এর দশকে এই সংগ্রাম তীব্রতর হয়। যখন তাদের সঙ্গে যোগ দেয় কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি, পুনর্গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি ও রায়পন্থীরা। নেহরুর লেখা ও বক্তৃতা এই প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ধনবাদী দুনিয়ায় মন্দা, সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য, পৃথিবী জুড়ে ফ্যাশিবিরোধী ঢেউ, এবং বহু ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীর মার্কসবাদের দিকে ঝোঁকও গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ১৯২০-র দশকের শেষদিকের যুব আন্দোলনের নেতারা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা এইসব প্রভাবের ফলে সমাজবাদের দিকে ঝুঁকেছিল, কারণ ১৯৩২-৩৩ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ভেঙে যাওয়া এবং ১৯৩৪-এর পর তার জায়গায় গঠনমূলক কাজ ও সংসদীয় কাজকর্ম এসে যাওয়া তাদের মধ্যে গান্ধীবাদী ধাঁচের রাজনীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে প্রতিভাবান প্রায় সব তরুণ বুদ্ধিজীবী কোনো এক ধরনের সমাজবাদের দিকে ঝুঁকেছিল। উদীয়মান কৃষক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিও ক্রমেই বাম ঘেঁষা হয়ে পড়ছিল। ১৯৩৫-এর পর কংগ্রেস সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছিল। নেহরু ঢালাওভাবে দেশে সমাজবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন এবং কংগ্রেস ক্রমেই বেশী করে র‍্যাডিকাল হয়ে উঠছিল। তার প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৩১-এর করাচি প্রস্তাবে, ১৯৩৬-এর গোড়ায় লখনৌ কংগ্রেসে নেহরুর সভাপতি ভাষণে, ১৯৩৬-এর শেষদিকে কংগ্রেসের ফয়েজপুর অধিবেশনে গৃহীত র‍্যাডিকাল কৃষি-কর্মসূচীতে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির জন্য ১৯৩৭ সালের নির্বাচন উপলক্ষে র‍্যাডিকাল নির্বাচনী ইস্তাহার গ্রহণে, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনে, যুদ্ধ ও ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে এবং ১৯৩৭-৩৯-এ কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কৃষকদের পক্ষে আইন প্রণয়নে। এই সময়ে একাধিক জাতীয়তাবাদী নেতা ও বহু বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নেতা মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি দেশের একাধিক প্রান্তে,

যেমন কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ ও উড়িশ্যায় কংগ্রেসের সংগঠনের ওপর দৃঢ় বা এমনকি প্রাধান্যমূলক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এই সময়টি সমাজবাদী ধ্যান-ধারণার পক্ষে এতই অনুকূল ছিল, এবং তা এত ব্যাপকভাবে ও দ্রুত ছড়িয়েছিল, যাতে মনে হয়েছিল যে বামপন্থীরা আরেকটু হলেই কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের সমাজবাদী দিশায় মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলবে। কিন্তু সে সুযোগ তারা হারিয়েছিল, সে সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছিল। বামপন্থীরা সংখ্যায় বেড়েছিল—নেহরু ও সুভাষ ১৯৩৬-৩৯-এ কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন; সি. পি. আই, সি. এস. পি. ও রায়পন্থীদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটেছিল জ্যামিতিক হারে—এবং তারা কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র আন্দোলন, প্রগতি লেখক সংঘ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নারী সংগঠন গড়ে তুলতে, বামপন্থী পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে, ব্যাপক স্তরে মার্কসবাদকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু তারা জাতীয় আন্দোলনের ওপর মতাদর্শগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, অর্থাৎ কংগ্রেসের মতাদর্শে মৌলিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই ব্যর্থতার কারণ কী! আমাদের ধারণা, যেহেতু বামপন্থীরা কংগ্রেসের মধ্যে অবাধে কাজ করতে পারতো, সেহেতু এর উত্তর খুঁজতে হবে কংগ্রেসের ওপর দক্ষিণপন্থীদের বা গান্ধীর প্রবল প্রভাবের মধ্যে নয়, বামপন্থীদের তত্ত্ব ও কাজের মধ্যে। অন্য জায়গায়, যেখানে বামপন্থীদের ইতিহাসের সঙ্গে কংগ্রেসের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ দেখানো হয়েছে, আমরা এটা করতে চেষ্টা করেছি।[৪০] আমাদের মূল উত্তর হ'ল এই যে, বামপন্থীরা, কখনো কখনো নেহরু ও সুভাষ বোস সহ, যে দক্ষিণপন্থাকে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিল, তাকে সংজ্ঞায়িত করেছিল ভুল, অ-মতাদর্শগত ভাবে। তারা অনেকসময় রণকৌশলগত প্রশ্নকে মতাদর্শগত ভাবে দেখেছে, এবং রণনীতিগত প্রেক্ষাপট ও সংগ্রামের রূপকে মতাদর্শগত অবস্থানের সঙ্গে এক করে ফেলেছে। অন্যদিকে, তারা শ্রমজীবী জনগণের সামূহিক সংগ্রাম বা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ধারণা বা অবস্থান সংক্রান্ত বিতর্কের ওপর জোর দিতে গিয়ে মতাদর্শগত কাজকে অবহেলা করার ঝোঁক দেখিয়েছে। সর্বোপরি, জটিল বাস্তব জগৎকে সমান জটিলভাবে না দেখে, বামপন্থীরা প্রথমে রাজনৈতিক ভারতকে তাদের সমালোচনা ও সমালোচনামূলক আদর্শে পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছে, এবং তারপর তাকে সফলভাবে সমালোচনা করেছে। ফলত, তারা বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে রণকৌশলগত বিষয়ে, এবং অহিংসা, সংগ্রামের রূপ, শ্রেণী সমঝোতা ও গান্ধী সহ কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও গণ আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতার

অভাব ইত্যাদি প্রশ্নে, যা, আমরা আগেই দেখিয়েছি, সংগ্রামের ইস্যু ছিলনা।

পাদটীকা

১. এই উপ-অধ্যায়ে আলোচিত সমগ্র প্রশ্নটি এখানে বিস্তারিত আলোচনার পক্ষে অনেক বড় ও জটিল। সুতরাং পরের মন্তব্যগুলিকে প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত, প্রাথমিক ও সরলীকৃত আলোচনা হিসাবে দেখতে হবে।

২. এই সমস্যার সমাধান বা অনুধাবন সহজতর হবে যদি জাতীয় আন্দোলন-এর জায়গায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কথাটি ব্যবহার করা হয়। আমরা এখনও চীন, ভিয়েতনাম, নিকারাগুয়া বা আফ্রিকার পূর্বতন পর্তুগীস উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় জাতীয় আন্দোলন বা প্রলেতারীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কথাটি শুনিনি। 'কৃষক জাতীয়তাবাদ' কথাটি অংশগ্রহণকারীরা কখনোই ব্যবহার করেনি, যদিও চীনের ক্ষেত্রে এই কথাটি কিছু মার্কিন গবেষক তৈরী করেছিলেন মূলত সমাজবাদী মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে খাটো করার জন্য। বর্তমানে এই কথাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত, কিন্তু একটি অভিজ্ঞতাবাদী সূত্রায়ন হিসাবে কৃষকদের অংশগ্রহণ বা কৃষকদেব দাবীর ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেই কেবল তা কোনো অর্থ বহন করে। বিশ্লেষণ বা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এর কোনো মূল্য নেই।

৩. কিন্তু এটা সত্যি নয় যে যতক্ষণ শ্রমিকশ্রেণী, অর্থাৎ তার রাজনৈতিক প্রতিনিধি—কোনোরকম একটি কমিউনিস্ট পার্টি—তাকে নিয়ন্ত্রণ না করছে বা নেতৃত্ব না দিচ্ছে, তা একটি বুর্জোয়া বা উচ্চশ্রেণীর আন্দোলন হয়ে যাচ্ছে বা থাকছে।

৪. এটা এই কথা বলার থেকে খুবই আলাদা যে ইয়োরোপের বৃহৎ অংশে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছিল বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত সমাবেশের এবং সামন্ত শ্রেণীদের বিরুদ্ধে তাদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সিকিভাগ থেকে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানের শাসক শ্রেণী জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করেছে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও, শ্রমিক-শ্রেণীকে অধস্তন অবস্থানে রাখতে। কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ায় এরকম ঘটেনি। সেখানে জাতীয়তাবাদ একটি শোষক শ্রেণীর দ্বারা আরেকটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি, সমগ্র সমাজের দ্বারা একটি বিদেশী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের বুর্জোয়া চরিত্রের কোনো অনিবার্যতা বা সার্বজনীনতা নেই। আরও স্থূল অথচ নাটকীয়ভাবে বলা যায়, গান্ধী, মাও, হো চি মিন বা শুক্কুল-এর জাতীয়তাবাদ ডিসরেলি বা হিটলার বা এমনকি কভুর বা বিসমার্ক-এর জাতীয়তাবাদের থেকে পুরোপুরি আলাদা ছিল, যদিও তার ঘনিষ্ট সাদৃশ্য ছিল হিটলারের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফ্রান্স, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদির প্রতিরোধের সঙ্গে এবং ১৯৪১-৪৫-এর সোভিয়েত জনগণের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সঙ্গে। আমরা যাদের সমালোচনা

করছি তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, ১৯৪০-৪৪-এর ফ্রান্সের প্রতিরোধ, যাতে দ গল-এর সঙ্গে কমিউনিস্টরাও অংশ নিয়েছিল, বুর্জোয়া চরিত্রের ছিল কিনা।

৫. আদিত্য মুখার্জী, "দি ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস : আসপেক্টস অভ ইটস্ ইকনমিক, পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড ইডিওলজিক্যাল ডিভ্যালপমেণ্ট ইন দা কলোনিয়াল পিরিয়ড।"

৬. কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী সদস্যরা কখনো কখনো একথা প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণ : "পন্থাটি জলের মতো পরিস্কার। তা হ'ল সক্রিয় গতিশীল অহিংস গণ-কর্মদ্যোগ।" তেন্দুলকার, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ৩, পৃ ৩০২-তে উদ্ধৃত। তার ওপর, একবার গণ-আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে, দক্ষিণপন্থীরা কোনো পর্যায়েই বা জন সন্নিবেশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি। আমাদের এটাও ভুলে গেলে চলবেনা যে সর্দার প্যাটেল সম্ভবত তাঁর সমসাময়িক অন্য যে কারোর থেকে বেশী জঙ্গী কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই দুটি প্রশ্নে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বড় তফাৎ ছিল জনগণ সংগ্রাম করতে কতটা তৈরী, সে সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে। বেশীরভাগ বামপন্থী মনে করতো যে জনগণ সবসময়েই জঙ্গী আন্দোলন করতে তৈরী ছিল, এবং তাও আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য! দক্ষিণপন্থীদের বেশীরভাগ মনে করতো যে কোনো কোনো সময়ে জনগণ এরকমভাবে তৈরী থাকতো, কোনো কোনো সময়ে নয়। চিত্তাকর্ষকভাবে, বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগ্রামগুলিতে তাদের কাজকর্ম, শ্রেণীগত ইস্যুগুলির চরিত্র এবং মতাদর্শগত দিক ছাড়া, দক্ষিণপন্থীদের কাজকর্মের খুবই কাছাকাছি ছিল। আমরা যেসব বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের বেশীরভাগই একথা সমর্থন করেছে।

৭ আরেকটি প্রবন্ধে আমি এই দিকগুলি আলোচনা করেছি : "স্ট্রাগল ফর দি ইডিওলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অভ দা ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন দা নাইনটিন থার্টিস।"

৮. ফ্রানসিন ফ্রাংকলেন, ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল ইকনমি ১৯৪৭-১৯৭৭, পৃ ৩৫...

৯. আয়ার্ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি আইরিশ কোয়েস্চেন।

১০. মাও জে দং, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড, ২, পৃ ২৬৪।

১১. ঐ, পৃ ২৫০ (জোর আরোপিত)।

১২. ঐ, পৃ ২৬৩।

১৩. এদের এবং মাও জে দং-এর অবস্থানের জন্য দেখুন, ভগবান যোশ, "মিনিস্ট্রিস অ্যাণ্ড দা লেফ্ট।"

১৪. সি. পি. আই-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি যোশী ১৯৪৫ সালে গান্ধীকে যুদ্ধের সময়ে পার্টির শ্রেণী সংগ্রাম নীতি সম্পর্কে লিখেছিলেন : "আমরা ধর্মঘটের নীতি পরিত্যাগ করেছি কারণ আমাদের মনে হয়েছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তা জাতীয় স্বার্থবিরোধী।...আমরা যে সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে যখন

তাদের বস্তুগত অবস্থার অবনতি ঘটছে এমন সময়েও ধর্মঘট করা থেকে বিরত করতে পেরেছি, তা কেবল তাদের ওপর আমাদের প্রভাবকেই দেখিয়ে দেয়না, জাতীয় স্বার্থকে তাদের নিজেদের স্বার্থ বলে বোঝার ক্ষমতাকেও দেখিয়ে দেয়।" করেসপণ্ডেন্স বিটুইন মহাত্মা গান্ধী অ্যাণ্ড পি. সি. যোশী, পৃ. ১২।

১৫. উদাহরণস্বরূপ, গুজরাটে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা ১৯৩০-এর দশকে দাস শ্রমিক-হালপতিদের তাদের দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৩১-এ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সর্দার প্যাটেল এবং গান্ধী যুক্ত প্রদেশে খাজনা বন্ধ আন্দোলনকে অনুমোদন করেছিলেন।

১৬. এই পদক্ষেপগুলিকে অনেক সময় বামপন্থীদের অঙ্গীভূত করার ও চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে দক্ষিণপন্থীদের কৌশল বা প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হয়েছে। এর থেকে ভালো একটি ব্যাখ্যা হ'ল, দক্ষিণপন্থীরা শ্রেণী সমঝোতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যাপকতর জনপ্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতে পেরেছিল।

১৭. বি. বি. চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে বলা যায়ঃ "গড়ে ২৫ শতাংশ করে খাজনা কমে গিয়েছিল। জমিদারদের অনুমোদন ছাড়াই কৃষকদের জমি হস্তান্তর করতে দেওয়া হয়েছিল, এবং এই হস্তান্তরের সময় আগে তাদের যে সেলামী দিতে হ'ত তাও অনেক কমে গিয়েছিল। বকেয়া খাজনা না দিলে জমিদারদের দ্বারা কৃষকদের পুরো জমি বিক্রি করে দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। জমিদাররা কেবল তাদের জমির ততটুকু অংশই বিক্রি করতে পারতো, যা বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। মন্ত্রীসভা জমিদারদের কেবল নগদ খাজনা কমানোতেই রাজী করায়নি, ফসলের ভাগ কমানোতেও রাজী করিয়েছিল।" "অ্যাগ্রেরিয়ান মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল অ্যাণ্ড বিহার, ১৯১৯-১৯৩৯", এ. আর. দেশাই, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৬৪। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময়ে মাওজেদং দং-ও ২৫ শতাংশ খাজনা হ্রাসের সুপারিশ করেছিলেন। সিলেকটেড ওয়র্কস, খণ্ড ৩, পৃ. ২২১।

১৮ কালেকটেড ওয়র্কস, খণ্ড ৪৬, পৃ. ২০১, পৃ. ৩৬০-এর ভ্রম সংশোধন সহ।

১৯. ঐ, খণ্ড ৭৬, পৃ. ৩৬৭।

২০. আমার "কলোনিয়ালিসম্, স্টেজেস অভ কলোনিয়ালিসম অ্যাণ্ড দা কলোনিয়াল স্টেট" দেখুন।

২১. আমরা এই ধারণা বা সূত্রায়ণ নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। আমাদের মনে হয় এটা যথেষ্ট দ্ব্যর্থবোধক এবং হয়তো স্থূলও। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা অন্যত্র গোটা সমস্যাটাকে বিশদভাবে আলোচনা করছি, ততক্ষণ আমাদের এর ওপর নির্ভর করতেই হবে। এই পর্যায়ে আমরা কেবল একটি সংশোধনী যোগ করতে পারি। ধারণাটিকে তার 'দুর্বল' ভাব থেকে দেখতে হবে, 'দৃঢ়' ভাব থেকে নয়।

২২. আমাদের সাক্ষাৎকারগুলি থেকে দেখা যায়, সমগ্র ১৯৩০-এর দশকে এবং ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা অবামপন্থী কংগ্রেসকর্মীদের ওপর তাদের নিঃস্বার্থ কাজ ও জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দরুণ তীব্র প্রভাব ফেলেছিল।

২৩. তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারা ছিল। পরিবর্তন মানে আন্দোলনকে একটিমাত্র খাতে বইয়ে দেওয়া নয়। একটি বহুশ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনের পক্ষে বোধহয় নামেমাত্র বা বাস্তবে, কোনোভাবেই একটিমাত্র শ্রেণীর সম্পূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একটি বিশেষ ধারার একচেটিয়া অধিকার বা কর্তৃত্ব দাবী না করে বা মেনে না নিয়ে, কেবল আন্দোলনের ভার ক্রমশ একটি র‍্যাডিকাল দিশায় সরিয়ে আনতে হবে।

২৪. দেখুন এর্নেস্তো লাক্‌ল, পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইডিওলজি ইন মার্ক্সিস্ট থিয়োরী।

২৫. তা না হ'লে তারা শুধু জাতীয় আন্দোলনের ওপর সমাজবাদী কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হ'ত না, শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী সংগঠনগুলির ওপর প্রভাব সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করতেও অসুবিধা বোধ করতো।

২৬. জি. ডি. বিড়লা বা পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের মতো বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ও সুবিদিত ধারণা ছিল ঠিক এই, যে কংগ্রেস বুর্জোয়া বা অন্য কোনো একটিমাত্র শ্রেণীর করায়ত্ব বা তার স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ছিল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই জটিল ধারণার ফলেই জাতীয় আন্দোলনের ওপর বুর্জোয়া মতাদর্শগত কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সুবিধা হয়েছিল, যদিও তার মধ্যে কর্তৃত্বের তীব্র সংঘাত ছিল। দেখুন, আদিত্য মুখার্জী, পূর্বোল্লিখিত।

২৭. পার্থ সারথী গুপ্ত সম্প্রতি এর ব্যাখ্যা করেছেন সংস্কারবাদী মতাদর্শগত কর্তৃত্বের অধীনে একটি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হিসাবে।

২৮. আমরা দেখতে পাবো, একটি বড় তফাৎ ছিল এই, যে কংগ্রেস সমস্ত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ধারাকে, এমনকি তারা যদি হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র আনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতো অথবা তাদের নিজেদের বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকতো তাহ'লেও, যোগ দিতে দিয়েছিল, যেখানে লেবার পার্টি ট্রটস্কীপন্থী, কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং রাষ্ট্রের হিংসাত্মক উৎখাতে বিশ্বাসীদের যোগ দিতে দেয়নি।

২৯. সুতরাং তাদের মূল চিন্তার বিষয়টি 'বুর্জোয়া' ছিলনা; বুর্জোয়া শ্রেণীকে সেবা করা বা তাকে একটি শ্রেণী হিসাবে বিকশিত করা তার উদ্দেশ্য ছিলনা, তা ছিল ভারতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে বিকশিত করা, তাদের মতে একমাত্র যে যে পথেই সেই সময় তার বিকাশ হ'তে পারতো। সুতরাং তারা ছিল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, বুর্জোয়া নেতা নয়, বুর্জোয়াদের দালাল তো দূরের কথা। আমার দা রাইস অ্যাণ্ড গ্রোথ অভ ইকনমিক ন্যাশনালিসম্ ইন ইণ্ডিয়া, অধ্যায় ১৫ দেখুন। চিত্তাকর্ষকভাবে, যখন তারা দেখলো যে তাদের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রকল্পের শ্রেণী-মাধ্যমরা যথেষ্ট বেশী সংখ্যায় এগিয়ে আসছে না, তখন তারা নিজেরাই এই ভূমিকা নিতে চেষ্টা করলো, এবং তা করতে গিয়ে সাধারণত বিপুল ক্ষতি স্বীকার করলো। ঐ, পৃ ৮৫-৮।

৩০. তিনি মাঝে মাঝেই একথা বলেছেন। গোড়ার দিকে, ১৯২৪ সালে, এই মতের একটি উদাহরণের জন্য দেখুন কালেক্টেড ওয়র্কস, খণ্ড ২৫, পৃ ২৫১।

৩১. গান্ধীর যুগে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত ছিল কেবল অহিংসাকে রণকৌশল হিসাবে (আবশ্যিকভাবে নীতি হিসাবে নয়) গ্রহণ করা এবং কংগ্রেসের নামে কোনো গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য উচ্চতর নেতৃত্বের অনুমোদন নেওয়া।

৩২. আমরা আগেই দেখিয়েছি কীভাবে গান্ধী ১৯৪২-এর গুরুত্বপূর্ণ অগাস্ট প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সৎ স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করার ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সাহসের প্রশংসা করেছিলেন।

৩৩. ১৯৩৯-এ গান্ধীর বক্তব্য তুলনীয়: "যে ক্ষেত্রেই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সত্যাগ্রহ কোনো বাস্তব প্রস্তাব নয়। যে কোনো দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের পেছনে কংগ্রেসের সমগ্র শক্তি থাকা দরকার।" কালেক্টেড ওয়র্কস, খণ্ড ৬৯, পৃ ৩৬১।

৩৪. শ্রেণীগতভাবে তাঁর মতাদর্শের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কৃষক-হস্তশিল্পীবাদী বা ইউরোপীয় সমাজবাদী হিসাবে, যার মধ্যে ইউটোপীয় সমাজবাদের অনেক দুর্বল ও দৃঢ় দিক ছিল। তাঁকে মতাদর্শগতভাবে বুর্জোয়া বলে বর্ণনা করার অর্থ হ'ল, যে মার্কসবাদী নয় তাকেই বুর্জোয়া বলা।

৩৫. গান্ধীর অছিবাদের তত্ত্ব, যা মার্কসবাদের বিপরীত, অবশ্যই এই দিক দিয়ে একটি বড় ঘাটতি। কিন্তু তাকে তিনি সম্পত্তি সম্পর্কের বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে দেখানোর জন্য ব্যবহার করেননি: তিনি তাকে ক্রমশ আরো বেশী র‍্যাডিকাল দিকে বিকশিত করে শেষ পর্যন্ত কৃষকের হাতে জমির ধারণাটির ন্যায্যতা দেখানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

৩৬. অনেক সূত্রনির্দেশ করা যায়। আমরা আপাতত এই দিকটির বিশদ আলোচনা পরবর্তী কোনো সময়ের জন্য তুলে রাখছি। পাঠকরা গিওর্গি কালমার-এর গান্ধীজম্ এবং ফ্রাঁসিন ফ্রাংকনেল-এর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, অধ্যায় ১ ও ২ দেখতে পারেন।

৩৭. কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের সামাজিক মতাদর্শ নিয়ে প্রায় কোনো কাজই হয়নি। নীরজা সিং এই প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন। তাঁর প্রাথমিক কাজ, এম ফিল গবেষণাপত্র "দা রাইট অ্যাণ্ড দা রাইট-উইং পলিটিক্স ইন দা কংগ্রেস: ১৯৩৪-১৯৩৯" দেখুন।

৩৮. নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের সহযোগিতা আরও বেশী ছিল। আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের বেশীরভাগই এর সমর্থন করেছেন।

৩৯. দেখুন, এস. গোপাল, জওহরলাল নেহরু, আ বায়োগ্রাফি, খণ্ড ১, বিশেষত পৃ ১৮১ ২১৩-৪ ও ২১৮। এখানে কংগ্রেসের মতাদর্শগত পরিবর্তন সম্পর্কে নেহরুর অবস্থানের একটি অসাধারণ সারসংকলন করা হয়েছে।

৪০. বিপান চন্দ্র, "স্ট্রাগল্ ফর দি ইডিওলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অভ দা ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন দা নাইনটিন থার্টিস।"

৬

উপসংহার

আমাদের মনে হয়, জাতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন গতিপ্রকৃতির, বিশেষত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও গান্ধীর নির্দেশে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের রণনীতিগত অনুশীলনের, বিশ্ব ইতিহাসে একটি গুরুত্ব রয়েছে যা ব্রিটিশ, ফরাসী, রুশ, চীনা, কুবান ও ভিয়েতনামী বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। এটা হ'ল একটি আধা-গণতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক-ধাঁচের কাঠামোর প্রতিস্থাপিত বা পরিবর্তিত হওয়ার, ব্যাপক অর্থে গ্রামশির অবস্থানের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতের সফল অনুশীলনের একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উদাহরণ। এর অভিজ্ঞতার অধ্যয়ন ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের, অতীত ও বর্তমান উভয় কালেরই ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে।

এটা এমন এক দীর্ঘস্থায়ী কর্তৃত্বমূলক সংগ্রামের নির্দিষ্ট উদাহরণ, যাতে বিপ্লবের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হচ্ছে না, হচ্ছে একটি দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়, যেখানে গণসংগ্রামের মূল ভূমি হ'ল 'গণ-জাতীয়'[১], অর্থাৎ একটি জাতীয় বা সামাজিক স্তরে নৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্র, যাতে প্রতি-কর্তৃত্বের রসদ ধৈর্যের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে সঞ্চয় করা হয়, যাতে গণ-আন্দোলন সাময়িক কিন্তু রাজনীতি চিরন্তন, যাতে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সংগ্রাম পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়, প্রতিটি পর্যায় থাকে আগেরটির থেকে এক পা এগিয়ে, যাতে জনগণ সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং ক্যাডারদের "স্থায়ী সৈন্যদল"-এর ওপর নির্ভর করেনা এবং তা সত্ত্বেও ক্যাডাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, যাতে আন্দোলন অনিবার্য "নিষ্ক্রিয়" পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায় অথচ জনগণের রাজনৈতিক নীতিবোধ শুধু বজায় থাকেনা, উন্নত হয়!

এই আন্দোলন যত ত্রুটিপূর্ণভাবেই হোক, কিছু অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের আলোচনা করেছে: কীভাবে অঙ্গীভূত না হয়ে গিয়েও রাষ্ট্রের বিদ্যমান

সাংবিধানিক কাঠামোকে কাজে লাগানো যায়[২]; কীভাবে স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে সংগঠনের এবং জনগণের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়; কীভাবে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রকে মেলানো যায়; কীভাবে একটি সাধারণ উদ্দেশের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ-গত ও রাজনৈতিক ধারাকে ঐক্যবন্ধ করা যায়; কীভাবে আন্দোলনের ব্যাপকতর সংঘবন্ধতা এবং আঘাত হানার শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, রণনীতি, মতাদর্শগত কাঠামো, রাজনৈতিক কাজ ও সংগ্রামের রূপ ও অভ্যাস থেকে শুরু করে সাংগঠনিক নীতি ও অভ্যাস পর্যন্ত আন্দোলনের সমস্ত দিক নিয়ে জনগণের মধ্যে বিতর্ক চালাতে দেওয়া ও গড়ে তোলা যায়; কীভাবে অতীতের 'সমাধান'-এব মধ্যে আটকে না গিয়ে তার নিজের সমৃদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা যায়; কীভাবে নিজের শিকড় বা 'পূর্বসূরী'দের সঙ্গে যোগাযোগ না হারিয়ে পুনর্গঠন ও উদ্ভাবন করা যায়; কীভাবে বিশ্ব-প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখেও যে জনগণকে সন্নিবেশিত করতে চাওয়া হচ্ছে তাদের ঐতিহাসিক প্রতিভার ওপর নির্ভর করা যায়।

আমরা বলছিনা যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এই সমস্ত সমস্যার আদর্শ বা আবশ্যিকভাবে রূপায়ণযোগ্য সমাধান দিতে পেরেছিল বা এর সমাধানগুলি যেমন ছিল তেমনিভাবে আজকের বহুলাংশে পৃথক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত সামাজিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবন্ধ করতে পেরেছিল, এমন একটি জাতীয় ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন হিসাবে তাকে এমন অনেক প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়নি, যা ভারতের ইতিহাসের ঔপনিবেশিকতা-উত্তর পর্যায়ে কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করেছে এবং অন্য অনেক দেশে একক শতাব্দী বা তার বেশী সময় ধরেই করে আসছে। সে সসস্যাগুলি হ'ল একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সংক্রান্ত। তা সত্ত্বেও, আইনের শাসনের চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করছে এমন সমাজগুলিতে এবং গণতান্ত্রিক ও মূলগত-ভাবে নাগরিক অধিকারপন্থী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জন-সন্নিবেশ, গণ-জাতীয় এবং কর্তৃত্বমূলক সংগ্রাম বা অবস্থানের যুদ্ধের সমস্যাগুলির সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমস্যা ও পরিস্থিতির কিছু মিল রয়েছে। আমরা বলতে চাই যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং বিশেষত গান্ধীবাদী দর্শনের সঙ্গে পার্থক্য রেখে গান্ধীবাদী রাজনৈতিক রণনীতি ও নেতৃত্বের ধরনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার অধ্যয়নের, গণতান্ত্রিক, কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র ও সমাজের বৈপ্লবিক, অর্থাৎ মৌলিক, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, যাদের এই পরিবর্তন সবচেয়ে প্রয়োজন, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধ্যয়ন এখনও পর্যন্ত বিরল।

পাদটীকা

১. এই কথাটির জনক গ্রামশ্চি, এবং স্বতন্ত্রভাবে, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে. ভারতের কমিউনিস্ট নেতা অজয় ঘোষ।

২. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সম্বিত রাষ্ট্রগুলিতে অধিকাংশ র‍্যাডিকাল, পরিবর্তনকামী আন্দোলন হয় বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়েছে এবং তার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, নয়তো তার বাইরে কাজ করে প্রান্তিক অবস্থানে থেকে গেছে বা চলে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

এ আই সি সি পেপার্স, এন এম এম এল, নিউ দিল্লী।

ভগৎ সিং : **হোয়াই আই অ্যাম অ্যান এথিস্ট**, বিপান চন্দ্রর ভূমিকা সহ, দিল্লী, ১৯৭৯।

বুকি-গ্লুকসমান, ক্রিস্টিন : **গ্রামশি অ্যান্ড দা স্টেট**, লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট, লন্ডন, ১৯৮০।

চন্দ্র, বিপান : (১) **দা রাইস অ্যান্ড গ্রোথ অভ ইকনমিক ন্যাশনালিসম্ ইন ইন্ডিয়া**, পি পি এইচ, নিউ দিল্লী, ১৯৬৫।

(২) **ন্যাশনালিসম্ অ্যান্ড কলোনিয়ালিসম্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া**, ওরিয়েন্ট লংম্যান, দিল্লী, ১৯৭৯।

(৩) **কমিউনালিসম্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া**, বিকাশ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪।

(৪) "স্ট্রাগল্ ফর দি ইডিওলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অভ দা ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন দা নাইনটিন থার্টিস", **সোশাল সায়েন্টিস্ট**, নিউ দিল্লী, ১৫৯-১৬০, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

(৫) "কলোনিয়ালিসম্, স্টেজেস অভ কলোনিয়ালিসম্ অ্যান্ড দা কলোনিয়াল স্টেট" **জার্নাল অভ কনটেমপরারি** এশিয়া, লন্ডন, খণ্ড ১০, সংখ্যা ৩, ১৯৮০, এবং **লেফ্ট ভিউ**, নিউ দিল্লী, সংখ্যা ২, ডিসেম্বর ১৯৮৫।

চন্দ্র, বিপান ও অন্যান্য : **ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি**, বম্বে, ৬ মে ১৯৮৪।

চৌধুরী, বি বি : "অ্যাগ্রেরিয়ান মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার : ১৯১৯-৩৯", এ আর দেশাই, সম্পাঃ. **পেসান্ট স্ট্রাগল্স ইন ইন্ডিয়া**, ও ইউ পি, বম্বে, ১৯৭৯।

করেসপণ্ডেন্স বিটুইন মহাত্মা গান্ধী অ্যান্ড পি সি যোশী, পি পি এইচ, বম্বে, ১৯৪৫।

দেশাই, এ আর : **পেসান্ট স্ট্রাগল্স ইন ইন্ডিয়া**, ও ইউ পি, বম্বে, ১৯৭৯।

মাও জে দং : **সিলেক্টেড ওয়র্কস**, ৪ খণ্ড, লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট, লন্ডন, ১৯৫৪-৫৬।

ফেমিয়া, যোসেফ ভি : **গ্রামশিস পলিটিক্যাল থট**, ক্লারেনডন প্রেস, অক্সফর্ড, ১৯৮১।

ফ্রাংকলেন, ফ্রাঁসিন আর : **ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল ইকনমি,** ১৯৪৭-১৯৭৭। **দা গ্র্যাজুয়াল রেভোলিউশন,** ও ইউ পি, দিল্লী, ১৯৭৮।

গান্ধী, মহাত্মা : (১) **কালেকটেড ওয়র্কস,** ৯০ খণ্ড, পাব্লিকেশনস ডিভিশন, নিউ দিল্লী, বিভিন্ন তারিখ।

(২) **অ্যান অটোবায়োগ্রাফি,** নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আমেদাবাদ, তারিখ নেই।

গ্লেনডেভন, জন : **দা ভাইসরয় অ্যাট বে—লর্ড লিনলিথগো ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৩৬-১৯৪৩,** লণ্ডন, ১৯৭১।

গোপাল, এস : **জওহরলাল নেহরু—আ বায়োগ্রাফি,** খণ্ড ১, ১৮৮৯-১৯৪৭, জোনাথান কেপ, লণ্ডন, ১৯৭৫।

গ্রামশি, আন্তোনিও : **সিলেকশনস ফ্রম দা প্রিসন নোটবুকস,** লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন, ১৯৭১।

হাইগ পেপার্স, এন এম এম এল, নিউ দিল্লী।

হোম পলিটিক্যাল প্রসিডিংস, জাতীয় লেখ্যাগার, নিউ দিল্লী।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিপান চন্দ্র, সেণ্টার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিস, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ দিল্লী।

জোশ, ভগবান। "মিনিস্ট্রিস অ্যাণ্ড দা লেফট" মাইমিও, সেণ্টার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিস, জে এন ইউ, ১৮৮৫।

কালমার, গিওর্গি : **গান্ধীসম,** বুদাপেস্ত, ১৯৭৭।

কুদাইস্যা, জ্ঞানেশ : **অফিস অ্যাকসেপ্ট্যান্স অ্যাণ্ড দা কংগ্রেস ১৯৩৭-৩৯ : প্রেমিসেস অ্যাণ্ড পারসেপশনস,** এম ফিল গবেষণাপত্র, সেণ্টার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিস, জে এন ইউ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫।

লাকল, এর্নেস্তো : **পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইডিওলজি ইন মার্কসিস্ট থিয়োরী,** এন এল বি, লণ্ডন, ১৯৭৭।

লিনলিথগো পেপার্স, এন এম এম এল, নিউ দিল্লী।

লো, ডি এ : **কংগ্রেস অ্যাণ্ড দা রাজ : ফ্যাসেটস অভ দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯১৭-৪৭,** আর্নল্ড হাইনেমান, লণ্ডন, ১৯৭৭।

মহাজন, সুচেতা : "ব্রিটিশ পলিশি অ্যাণ্ড দা পপুলার ন্যাশনাল আপসার্জ, ১৯৪৫-৪৬", এ কে গুপ্ত, সম্পা : **মিথ অ্যাণ্ড রিয়্যালিটি—স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম ১৯৪৫-৪৭,** মনোহর, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭।

মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, এফ : **আয়ার্ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি আইরিশ কোয়েসচেন,** মস্কো, ১৯৭১।

মেনন, বিশালাক্ষী : **ন্যাশনাল মুভমেণ্ট, কংগ্রেস মিনিস্ট্রিস অ্যাণ্ড ইম্পিরিয়াল পলিসি : আ কেস স্টাডি অভ দা ইউ পি,** ১৯৩৭-৩৯, এম ফিল গবেষণাপত্র, সেণ্টার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিস, জে এন ইউ, ১৯৮১।

মুর, আর জে : (১) **দা ক্রাইসিস অভ ইণ্ডিয়ান ইউনিটি**, ১৯১৭-১৯৪০, ও ইউ পি, দিল্লী, ১৯৭৪।

(২) "দা প্রবলেম অভ ফ্রিডম উইথ ইউনিটি : লণ্ডনস ইণ্ডিয়া পলিসি, ১৯১৭-৪৭", ডি এ লো, **সম্পা : কংগ্রেস অ্যাণ্ড দা রাজ,** আর্নল্ড হাইনেমান, লণ্ডন, ১৯৭৭।

মুখার্জী, আদিত্য : "দি ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস : আসপেক্টস অভ ইট্‌স ইকনমিক, পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড ইডিওলজিক্যাল ডিভেলপমেণ্ট ইন দা কলোনিয়াল পিরিয়ড—১৯৩০-১৯৪৭", এস. ভট্টাচার্য ও রোমিলা থাপার, **সম্পা : সিচুয়েটিং ইণ্ডিয়ান হিস্টরি**, ও ইউ পি, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬।

মুখার্জী, মৃদুলা : "পেসাণ্ট রেসিস্‌ট্যান্স অ্যাণ্ড কনশাসনেস ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া : আ হিস্টরিওগ্রাফিক্যাল ক্রিটিক", মাইমিও, সেণ্টার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিস, জে এন ইউ, ১৯৮৫।

নন্দ, বি আর : **মহাত্মা গান্ধী : আ বায়োগ্রাফি**, ও ইউ পি, দিল্লী, ১৯৫৮।

নেহরু, জওহরলাল : (১) **সিলেক্‌টেড ওয়র্কস**, এ গোপাল সম্পাদিত, ১৫ খণ্ড, ওরিয়েণ্ট লংম্যান, দিল্লী, বিভিন্ন তারিখ।

(২) **আ বাণ্ড অভ ওল্ড লেটার্স**, এশিয়া, বম্বে, ১৯৫৮।

ওরাল হিস্টরি ট্রান্সক্রিপ্টস, এন এম এম এল, নিউ দিল্লী।

প্রসাদ, বিমল : **গান্ধী, নেহরু অ্যাণ্ড জে পি**, চাণক্য পাবলিকেশনস, দিল্লী, ১৯৮৫।

প্রসাদ, বিশ্বেশ্বর : **বণ্ডেজ অ্যাণ্ড ফ্রিডম**, খণ্ড ২, রাজেশ পাবলিকেশনস, নিউ দিল্লী, ১৯৭৯।

রাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স, এন এম এম এল এবং জাতীয় লেখ্যাগার, নিউ দিল্লী।

সেন, মোহিত : **দি ইণ্ডিয়ান রেভলিউশন—রিভিউ অ্যাণ্ড পার্সপেকটিভস**, পি পি এইচ, নিউ দিল্লী, ১৯৭০।

সিং, নীরজা : **দা রাইট অ্যাণ্ড দা রাইট-উইং পলিটিক্স ইন দা কংগ্রেস : ১৯৩৪--১৯৩৯,** এম ফিল গবেষণাপত্র, সেণ্টার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিস, জে এন ইউ, ১৯৮৪।

তেন্দুলকার, ডি জি : **মহাত্মা**, ৮ খণ্ড, পাবলিকেশনস ডিভিশন, নিউ দিল্লী, ১৯৬৯-এর পুনর্মুদ্রণ।

জাইদি, এ এম ও এস জি, **সম্পা : দি এনসাইক্লোপিডিয়া অভ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস**, নিউ দিল্লী, ১৯৭৬ থেকে।

শব্দসূচি